ভাগীরথী

প্রফুল্ল রায়

সাহিত্যম্ । ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশক : ১৯৬১

প্রকাশক :
সাহিত্যম্
নির্মলকুমার সাহা
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রাপ্তিস্থান :
নির্মল বুক এজেন্সী
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

নির্মল পুস্তকালয়
১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

মুদ্রক :
লোকনাথ বাইণ্ডিং অ্যাণ্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কাস
২৪বি, কলেজ রো
কলিকাতা - ৭০০ ০০৯

পৌষ সংক্রান্তি।

হাড়-কাঁপান শীত নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে। ক্রমাগত সূর্যের আশীর্বাদে-ধন্যা পৃথিবীর বুকে সবুজের বিপুল সম্ভার। কৃষক আমন ধানের রাশ টেনে এনেছে খামারে খামারে। ধানের আঁটি সাজিয়ে সাজিয়ে তৈরি করেছে 'গাদা'। গাদা তো নয়, কৃষকের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতার প্রতীক। সারা বছরের ঘাম-রক্ত-ঝরা পরিশ্রম জন্ম দিয়েছে স্ফটিক-কণাগুলির। ওদিকে বার বার তাকায় আর বিহ্বল হয় কৃষকের হৃদয়।

মাটির উঠোন খটখটে শুকনো। গোবর-মাটি দিয়ে মনের মত করে লেপা-পোঁছা। মসৃণ! সিঁদুর পড়লে সবটুকু উঠিয়ে নেওয়া যায়। আজ কৃষক পরিবার ঝকঝকে তকতকে উঠোনে আহ্বান জানাবে ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা লক্ষ্মীকে। সারা উঠোন আলপনায় ভরা। গোয়াল ভরা গরু। গোলা ভরা ধান। পুকুর ভরা মাছ। বাগান ভরা ফল ফসল। তার মাঝখানে মা লক্ষ্মীর আসন। আসনের ওপর বেতের 'রেক' ভরা ধান। তার ওপর 'মোটবিঁড়ে'। ধানের শিষ কেটে মূল গুচ্ছটিকে অসংখ্য গুচ্ছ দিয়ে বাঁধা। এর মধ্যে আছে শিল্পীর নিপুণ হাতের সযত্ন কৃতিত্ব। বাড়ি বাড়ি চলেছে আলপনা আর 'মোটবিঁড়ে' তৈরির প্রতিযোগিতা।

ধান্যলক্ষ্মী ছাড়া সামনে থাকবে ছোট ঘট। মাথায় আম্র শাখা। ছোট একটা পুষ্ট ফল দিতে হবে ঘটের মাথায়। সিঁদুর মাখিয়ে। তার ওপর রাখতে হবে একটা 'বাউনি'। শীষ-সমেত খড়ের গুচ্ছে পাকান অবস্থায়। তার পাকে পাকে গোঁজা থাকবে সর্ষে মুলো আর গাঁদা ফুল। দূর্বা তুলসী পাতা। আজ ঘরের যা কিছু জীবনধারনের উপযোগী আর মূল্যবান তা বেঁধে রাখা হবে বাউনির বন্ধনে। কৃষক জীবনের ছোট্ট আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন কোনক্রমে সরে না যায়। অগাধ ঐশ্বর্যের কামনা করে না কৃষক। ঘামের বিনিময়ে ছোট্ট পাওনাগুলো ধরে রাখতে চায় মাত্র।

এই অনুষ্ঠানের জন্য শুদ্ধাচারের সীমা নেই। ধূপ ধুনো গঙ্গাজল। পুজোর নানাবিধ উপকরণ। তিলের পাটালি। নতুন গুড়ের মকরচাল। নতুন আতপের নৈবেদ্য। বাড়ি বাড়ি তাই নিয়ে উল্লাস। শঙ্খধ্বনি সহকারে

পুজো, উৎসব।

সর্বাণী গলায় কাপড় দিয়ে বসে। পুজো শেষে ভক্তি-ভরে প্রণাম করে।

শতদ্রুর গলায় উপবীত দেওয়া হয়েছে আগে-ভাগে। সে আজ এ পাড়ার ব্রাহ্মণ। বাবা রাজেশ্বর বিকালের আগেই হ্যারিকেন হাতে নামাবলী আর গামছা-কাঁধে বেরিয়ে গেছেন পাশের গ্রামে পুজো সারতে।

পুজো শেষে সর্বাণী বলে, এটা আসলে চাষীদেরই উৎসব। ওদের দেখা-দেখি গ্রামে সব শ্রেণীর মানুষই এই ধরনের লক্ষ্মী আরাধনায় নেমে পড়েছে। এর ভিতরের ব্যাপারটা অবশ্য কম লোকই বোঝে। না বুঝে না জেনে দেখা-দেখি অনেক জিনিসই তো চলে আসছে এ দেশে।

শতদ্রু ব্যাপারটা অতটা তলিয়ে বোঝে না। তবু বিজ্ঞ সমজদারের ভঙ্গীতে বলে, তা তো হচ্ছেই।

জ্ঞানদাময়ী গায়ে একটা মোটা সুতি-চাদর জড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলেন, আমার বাপের বাড়িতে বাউনি দেওয়া হয় সংক্রান্তির আগের দিন। এখানে দেওয়া হয় সংক্রান্তির দিন। দিনের তফাৎ থাকলেও আসল জিনিসটা কিন্তু একই ধরনের বৌমা।

সর্বাণী সহাস্যে বলে, বাংলাদেশে এক পাড়ার রীতির সঙ্গে অন্য পাড়ার রীতি-পদ্ধতির কোন মিল নেই। কিন্তু চিন্তা-ভাবনার স্রোতটা একই পথে বয়ে যাচ্ছে মা।

হুহু করে ছুটে আসছে উত্তুরে বাতাস। দাপটে দাঁতে দাঁতে করতাল বাজে। আকাশের নীলে খোদাই অসংখ্য উজ্জ্বল প্রদীপ। আলপনা ভরা উঠোনে দাঁড়িয়ে সর্বাণী জ্ঞানদাময়ী কথাবার্তা বলে। শতদ্রু কিছুক্ষণ তাকায় আকাশের দিকে। কেমন যেন এক ধরনের নেশা লেগে যায় তার। কিছুক্ষণ কাটাতে হবে এই ভাবে। একটি বিশেষ মুহূর্তের জন্যে।

শিয়াল ডাকে পূর্ব দিকের জঙ্গলে। সর্বাণী জলভরা ভৃঙ্গার নেয় এক হাতে, এক হাতে শাঁখ বাজাতে বাজাতে পরিক্রমা করে লক্ষ্মী-আলপনার চার দিক। শতদ্রু ঘণ্টা বাজায়। জ্ঞানদাময়ী কাঁসর। অশুভ শক্তির হুংকার যেন স্পর্শ করতে না পারে সযত্ন রক্ষিত শস্য ফসল ধনদৌলত। তারই জন্যে এই 'জলগণ্ডী'। বাদ্য বাজনার মধ্যে প্রতিরোধ প্রতিবাদ ব্যবস্থা।

শতদ্রু জ্ঞানদাময়ীর দিকে তাকিয়ে থাকে। মুখ চোখের আকৃতি নিখুঁত। বাজপেয়ী বাড়িতে দুর্গা প্রতিমা তৈরির সময় সে অনেক সময় হাঁ করে তাকিয়ে

থাকে। বিশেষ করে চোখ আঁকার সময়। একদিন পোটোর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বেরিয়ে আসে, চোখ সুন্দর না হলে মুখের সৌন্দর্য বাড়ে না। সেদিন ডাগর চোখ টানা-ভুরু ইত্যাদির কথা বর্ণনা করেছিল পোটো। সে কথা মনে আছে শতদ্রুর। তার পর থেকে সেই বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছে অনেকের চোখ-মুখ। চোখের ওপর মুখের সৌন্দর্য নির্ভর করে কিনা? খুঁতিয়ে দেখেছে!

আরো একটা জিনিস আবিষ্কার করেছে শতদ্রু। পূর্ণতাই সত্যিকারের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। অরণ্যের নিরাবরণ নিরাভরণ মানুষের দেহশ্রী থেকে চোখ ফেরান যায় না। সুঠাম স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যের পূর্ণতাই এই সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে।

সন্ধ্যায় ভাগীরথীতীরে চুপচাপ বসে থাকে শতদ্রু। ওপারের গাঢ় সবুজ গাছপালার পরিপূর্ণ রূপ তার চোখের সামনে একটা নতুন জগৎ সৃষ্টি করে। এপারের গাঙ্গুলী বাগানের পূর্ব দিকটা দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে বুনো গাছগাছালিতে ভরে গেলেও এক অনবদ্য সৌন্দর্যের জন্ম দিয়েছে। এর মূল রহস্য উদ্ঘাটন করতে পেরে শতদ্রুর মন আনন্দে নেচে ওঠে। গাছপালার ঘন সবুজ রঙের ফাঁকে ফাঁকে নাম-না-জানা বাহারী ফুলের গুচ্ছ। অদৃশ্য কোন শিল্পীর হাতের সুপটু আঁচড় সে ওর মধ্যে আবিষ্কার করে। এভাবেই একটা সৌন্দর্য রূপ পেয়েছে। অজস্র অফুরন্ত এর রঙ রূপ।

দুপুরে জ্ঞানদাময়ী বসেন পঞ্চানন কর্মকারের ছবি দিয়ে ছাপা ভারতচন্দ্রের বইখানা নিয়ে। কলকাতা থেকে প্রথম যখন বইখানা ছাপা হয় সেই সংস্করণ এটা। এই বইখানা যোগাড় করতে কি কষ্ট হয়েছিল সে কাহিনী বলেন তিনি। এ ছাড়া পুরাতন বঙ্গদর্শন পত্রিকার গুচ্ছ জমা আছে তার ঘরের বিরাট কলুঙ্গিতে। এর কোনো লেখার মধ্যে যখন তিনি ডুবে যান তখন তার মুখখানা দেখতে কি ভালই না লাগে। এক অদ্ভুত রশ্মি যেন তার মুখ থেকে বিচ্ছুরিত হয়। শতদ্রুর মনে এই ছবি খোদাই হয়ে যায়। জ্ঞানদাময়ী মাঝে মাঝে সর্বাণীকে পড়ে শোনান। ব্যাখ্যা করেন। দূর থেকে সেই কণ্ঠ শোনে শতদ্রু। কি মিষ্টি সেই কথাবার্তা। 'যে বাড়িতে রোগীর সেবা হয় না, অতিথির অসম্মান হয় সে বাড়ি শ্মশান। কিংবা ঘরের শান্তির ওপর পা রেখে বিশ্বশান্তির কথা ভাবা যায়।'

গায়ের রঙ অত সুন্দর না হলেও সর্বাণীর চোখে মুখে দৃঢ়তার আর আভিজাত্যের ছাপ। মাতৃত্বের কোমল রসধারা টলমল করে তার দু'চোখের

তারায়। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে ঝরণার মত নেমে আসে ভালবাসার স্রোত। সেবা-যত্নের রূপ নিয়ে তা ফুটে ওঠে প্রতিটি কাজকর্মে। এই প্রাণচঞ্চল মূর্তিটিকে বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে জড়িয়ে ধরে জ্ঞানদাময়ী বলেন, মা আমার অন্নপূর্ণা—

পাড়া জুড়ে শঙ্খধ্বনি আর কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ ওঠে। পুজো। পুজো শেষে বাউনি দিয়ে শক্ত বন্ধনী রেখায় কৃষক ধরে রাখতে চায় ঘাম ঝরান ফসল। ধানের গাদায়-গাদায় বাউনি ঝোলায়। বাউনি বাঁধে ধানের গোলায় গোলায়। এই আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সারা দেশ জুড়ে যে সতর্কতা দেখান হয় তা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে না। নিছক আচার অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ হয়।

॥ ২ ॥

মহাজনের ঋণের টাকা শোধ করার জন্যে আগেই ধান ঝেড়ে ধান-খড় বেচে দিতে হয়েছে পঞ্চু মোড়লকে। তবু তার স্ত্রী ভাঙা ঘরের চালের বাতায় বাউনি বাঁধে। শূন্য গোলার চালে ঝুলিয়ে দেয় সোনালী খড়ের পবিত্র-সূত্র। পুরোহিতের পুজোর পর উদাস চোখে পঞ্চু মোড়লের বৌ শঙ্খধ্বনি করে। শিয়াল বা পেঁচা ডাকার পর পবিত্র পাত্রের জল দিয়ে গণ্ডী টানে। কিন্তু তার গণ্ডী অনেক আগেই তো ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। এ ঘটনা শুধু পঞ্চু মোড়লের জীবনে সীমাবদ্ধ নয়। প্রায় সমস্ত কৃষকের জীবনের ছবি একই রকম।

পঞ্চু মোড়লের তিনপুরুষ চাষবাস করে জীবন ধারণ করে। হিসাব-নিকাশ করে দেখলে দেখা যাবে আরো কয়েক পুরুষ বোধ হয় এই ভাবেই জীবন কাটিয়েছে। পাঁচ শতক জমির ওপর বাস্তু আর ছোট্ট একটা ডোবা নিয়ে চলেছে জীবন। মেদিনীপুর থেকে এসেছে তার পূর্বপুরুষেরা ম্যালেরিয়া রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। পঞ্চু কয়েকবার কপালে আঙুলের টোকা মেরে চোখ নাচিয়ে বলে, ওসব কথা ছাড়। বানান গপ্প। আসল জিনিস হলো পেটের দায়ে পালিয়ে এসেছিল রূপনারায়ণ আর দামোদর পার হয়ে ভাগীরথীর চরে। পঞ্চুর বাম চোখের পাতায় মস্ত বড় এক আঁচিল। মাঝারি চোখ। মাথার চুলের বেশিরভাগ সাদা হয়ে গেছে। সব কিছু মিলে তার

ভাবভঙ্গী চোখে পড়ার মত।

স্ত্রী চারুবালা বলে, মোড়ল মশাই কথা বেচে খায়। তাই আমার বাবা ওর হাতে মেয়েটাকে তুলে দিয়েছিল। বলেছিল, সব কিছু হারিয়ে গেলেও বাবা আমার কথার জোরে ভাতের ব্যবস্থা করে দেবে।

পঞ্চু চোখ নাচিয়ে বলে, শুধু ভাত হলে তো আর জীবন চলবে নে। আরো কিছু চাই তার ওপর।

তাতো চাই। পাছা-পাড় শাড়ি। বাঁকি মল। কোমরে গোট। হাতে বাজু। ছেলের কোমরে বটফল। পানের সঙ্গে দোক্তা।

পঞ্চু সহাস্যে বলে, ছাঁচতলায় প্যাচ প্যাচ করে পিক্ ফেলা। রাঙা টুকটুকে বৌমা ঘরে আনা। আগল-দঘল বৈঠকখানায় বেহাই-বেহানের সঙ্গে বসে খোশ-গল্প করা। বল—বল—বলে যাও।

পঞ্চুর চোখে-ভাসা স্বপ্নের ছবিগুলো তিরতির করে ভাসে চারুবালার চোখে মুখেও। আনন্দে উচ্ছ্বসিত দু'খানা মুখ পৃথিবীর বুকে এসে কি বা এমন চায়? অতি সামান্যতেই তারা খুশি। কোনো সাম্রাজ্যের উত্থান পতন ঘটলো। পৃথিবীর বুকে কারা শক্তি হাতে পেলো। কারা ক্ষমতাচ্যুত হলো তা তারা জানে না। জানার প্রয়োজন আছে বলেও মনে করে না। কিন্তু একটা জায়গায় বোধহয় দারুণ ভুল করে তারা। ছোট্ট মাছের মত তিরতির করে ভাসতে চায় বিরাট সমাজ সংসারে। এখানে বড় মাছের হাঙরমুখো হাঁ করা চেহারা তো থাকবেই। এদের তাড়া খেয়ে জীবন বাঁচান প্রতি মুহূর্তে সংকট সৃষ্টি করবে। দেশে দেশে এই চুনোপুঁটির দল সমাজের বিরাট দীঘিতে হয় মরছে, না হয় মরার দিন গুণছে।

পঞ্চুর খুব ভাল লাগে লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আঁকা আলপনা দেখতে। ভাল লাগে খামারে খামারে সোনালী ধানের গোল-করে-তোলা গাদার সারি দেখতে। গাদার ছাউনির ওপর 'শেষ খড়ের' আঁটি দিয়ে 'মাথা-মারা।' এক একটা ধানের গাদা তো নয়, মা লক্ষ্মীর জীবন্ত আশীর্বাদ যেন।

রাত্রি বেড়ে যায়। ক'বছর ঘ্যান ঘ্যান করার পর গতবছর অগ্রহায়ণ মাসে চারুবালা ভুলভুলি কাঁথাটার ওপর খান দুই ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে পাড়ের সুতোয় সেলাই দিয়েছে। ওখানা গায়ে দিয়ে পৌষের হাড়কাঁপান শীত কাটান যায় না। চারুবালা সারা দিনের কাজকর্মের পর নিঃসাড়ে 'কাঠের-গোড়ের' মত পড়ে থাকে। প্রহরের পর প্রহর জেগে কাটায় পঞ্চু। তার পর কখন একটু

ঘুমিয়ে পড়ে তার ঠিক নেই। দোয়েল-নাচা দিনের আলোয় ঘুম ভেঙে যায় তার। সমস্যার পর সমস্যা ছুটে আসে সারাটা দিনের খরস্রোত বেয়ে।

বাঁড়ুজ্যে বাবুদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা জমা দিয়ে পঞ্চু জমি বন্দোবস্ত নেয়। আগেকার চাষীদের থেকে বিঘা প্রতি কুড়ি টাকা বেশি দিয়ে। না বলার উপায় নেই। অন্য কেউ নিয়ে নেবে। একবার ভেবেছিল এত টাকা দিয়ে জমি নিয়ে কাজ নেই। পরে ভেবেছে চাষীর ছেলে জমি ছাড়া জীবন চলবে কি করে? সবাই এই ভাবে জীবন চালাচ্ছে। পরের জমিতে গতর খাটিয়ে চাষীর মনের সাধ-আহ্লাদ পূরণ হয় নাকি?

তাই জমি নিল পঞ্চু। চড়া দামেই। স্বামী স্ত্রী ছেলেপুলে নিয়ে কাজ করলো। ফসলটাও ভাল হলো। কিন্তু আটকে গেল মোক্ষম জায়গায়। জমার টাকা চড়া সুদে ধার নিতে হয়েছিল বিহারী ঠাকুরের কাছে। ঠাকুরমশাই খামারে ধান ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তাগিদ দিতে আরম্ভ করলেন, পঞ্চু টাকাটা এবার শোধ দাও—

কচিরাম গুলে নিতাই হারান তো টাকা ধার নিয়েচে। ওদের তো কিছু বোলচোনি?

ওরা হলো আমার পুরাতন খাতক। তুমি ওদের মতন হও। তখন তুমিও পরে পরে শোধ দেবে। বিশ্বাসী হও। বিশ্বাস রাখ। একদিনে কি আর হয় এসব? ওদের সঙ্গে আর কারো তুলনা কোরো না পঞ্চু!

কালের পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ তাদের সঙ্গে অন্যদের তুলনা করা যায় না। বিহারী ঠাকুরের গোয়ালঘর পড়ে যাচ্ছে। কচিরাম গুলে নিতাই বিদ্যুতের গতিতে হাজির হয়ে যায়। কাজকর্ম সামলে দেয়। খড় কম হলে নিজেদের 'চাল ভেঙে' নিয়ে আসে। সন্ধ্যার আসরে প্রায় প্রতিদিন এসে হাজির হয় ওরা। নিত্য সঙ্গী।

বিহারী ঠাকুর বলেন, ঠাকুর দেবতারাও স্তবস্তুতি শুনে বর দিয়ে দেয়। মানুষও আমড়াগাছি করলে গলে যাবে না কচিরাম? আমরা মানুষ। ঠাকুর দেবতার থেকে তো বড় নয়!

ঠাকুরমশাই আপনি দেবতা। যে দেশে মহাজন নেই সে দেশে বাস করতে নেই।

ওদের এই ধরনের আনুগত্য দেখে বিড়ি টানতে-টানতে মুচকি-মুচকি হাসতে থাকে বিহারী। মুখ ফুটে বলে ফেলে, দরকার হলে তোদের

বউরাও এসে—

কথাটা বুকের একটা নরম জায়গায় তীরের ফলার মত বিঁধলেও প্রতিবাদ করতে পারে না কচিরাম গুলে নিতাই হারানের দল। শুধু হাসে। সে হাসির মধ্যে কি আছে না দেখলে বোঝা শক্ত। বিহারী কিন্তু এই হাসি দেখেই আনন্দ পায়। বোঝে, শিরদাঁড়া ভাঙা কেউটে। এদের করার কিছু নেই। এই ভাবেই এদের খেলাতে হয়।

পণ্ডুর চোখের সামনে ভেসে ওঠে ভবানীবাবুর ছবি। ছোট্ট জমিদার কিন্তু তার দাপট সিংহবিক্রমকেও হার মানায়। আড়ালে আবডালে লোকজন বলাবলি করে, 'নেইয়ের ঘরে খাঁই বেশি।' ভবানীবাবুর সম্পদে ঘাটতি আছে তাই খাঁই বেশি।

ভবানী বাঁড়ুজ্যে কাছারিবাড়িতে বসে মাঝে মাঝে কেশবিরল মস্তকটি দোলাতে দোলাতে বলেন, তোরা যা বলাবলি করিস তা খুবই সত্যি। আমার যা আছে তা খুবই কম। ঐশ্বর্যগড়ে এই বাড়িঘর। ভবানীপুরে বিঘে দুই জমির ওপর বাড়ি। বাওয়ালীর মোড়ল বাবুদের মত জমিদারী তো আমার নেই। তোরা কজন হাতে গোনা প্রজা মাত্র।

ভবানীবাবুর উজ্জ্বল বর্ণ উন্নত নাসিকা গোল চোখ শীতের ভাগীরথীর শান্ত ধারার মত। কিন্তু সে রঙ কেমন যেন পাল্টে যায় যখন মুখ দিয়ে উচ্চারণ হয়, 'সবই শুনি বাবা—সবই দেখি। আমাদের কান দিয়ে দেখতে হয় বাবা।' এ সময় কালবৈশাখীর ঝড়ের প্রলয়ঙ্কর রূপ দেখা যায় ভবানীবাবুর সারা অবয়বে। ভবানীবাবুর এই চেহারা দেখে আর কথা শুনে মরমে মরে যায় কৃষকেরা। পালাতে পারলে বাঁচে যেন। কিন্তু কাজ শেষ না হলে তো পালান যায় না। প্রতি বছর জমির 'অগ্রিম জমা' বাড়ে। আঠায় লেপটান কীটের মত ঘামতে থাকে চাষীরা কাছারিতে বসে।

ভবানীবাবুর দুই দারোয়ান রামকিষণ আর রামপীরিত। একজোড়া জোয়ান বলদের মত সারাদিন সারা এলাকা চষে বেড়ায়। খবরের পর খবর ছোটে। ওদের দেখে পাড়ার ছেলেপুলে হৈচৈ করে। চিৎকার করে বলে, চিংড়ি মাছের শোঁ—এই চিংড়ি মাছের শোঁ—। শোনার সঙ্গে সঙ্গে তেলেবেগুনে জ্বলে যায় রামপীরিত আর রামকিষণ। নিরামিশভোজী দুই ছত্রী চিংড়ি মাছ কি তা ভাল ভাবেই জানে। তাদের গোঁফকে চিংড়ি মাছের শোঁ বলবে এটা তারা আদৌ বরদাস্ত করতে পারে না। পড়ি কি মরি অবস্থায় লাঠি উঁচিয়ে ছোটে।

তেলে-পাকান লাঠি দেখে ভয়ে লুকোতে থাকে ছেলের দল। রামকিষণ রাম-পীরিত রাগে ফুঁশতে থাকে, শালা—বদমাশ—

এদের দিয়েই বড়বড় কাজ হয়ে যায় জমিদারবাবুদের। গরীব চাষীরা ভীষণ ভয় পায় এদের দেখে। এদের কথা ভবানীবাবুর কাছে বেদবাক্য। চাষীদের কথার কোন দাম থাকে না। ভবানীবাবু এদের দিয়ে যা ইচ্ছা করিয়ে নিতে পারেন। মায় পাকা ধানে মই দেয়া পর্যন্ত।

গামছা কাঁধে চাষীরা আসে। হাত জোড় করে প্রণাম জানায়। কেউ কেউ মাটিতে সারা শরীর লুটিয়ে দিয়ে পায়ের ধুলো নেয়।

নামকা-ওয়াস্তে একজন নায়েববাবু থাকলেও পুরো কাজকর্ম দেখেন ভবানীবাবু নিজেই। কাজ করতে করতে সবকিছু তাঁর নখদর্পণে এসে গেছে। আশেপাশে কয়েকখানা মৌজায় দাগ খতিয়ানের তালিকা তিনি মুখে মুখে বলে দিতে পারেন। এইসব জমিতে কারা প্রজা তাদের নাম সমেত। তাই নায়েববাবু খুব একটা মুখ খুলতে পারেন না। তবে মাঝে মাঝে তার ওপর টুক্‌রোটাক্‌রা যে সমস্ত কাজ পড়ে তা সেরে দিয়ে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। তাই নায়েব বিনোদ সরকার চাকরি করে খুব একটা খুশি নয়। কিন্তু কাজ না করে উপায় কি? কায়স্থ ঘরের ছেলের অন্য কোন কাজ তো জানা নেই। তাই অগত্যা পড়ে থাকে ঘাটের কাঠের মত। সুযোগ খোঁজে পালিয়ে যাবার। কিন্তু পথ নেই। বাবা এখানে হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে গেলেন। আগে একটু আনন্দই পেয়েছিল বিনোদ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কর্পূরের মত উবে যায়। এখন কাজ ছাড়ার পথ নেই। বিয়ে থা হবার পর দুটো ছেলে মেয়েও হয়েছে। সংসারের খরচ বেড়েছে। মূল শিকড় মাটি ফুঁড়ে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। আজ বিনোদ তাই ইচ্ছা অনিচ্ছার ঊর্ধ্বে। দণ্ডায়মান গাছের মত খাড়া। তার নিজস্ব মতামতেরও কোন মূল্য নেই।

কাঁচরাম পণ্ডুর বাড়ি আসে। নিজের বাড়ি থেকে 'সরুচাক্‌লি' নতুন গুড় 'আস্‌কে' আর কিছু মিষ্টান্ন আনে। কাঁচরাম পণ্ডুর সংকটের কথা জানে। বাঁকা তড়পি চেহারা। দুচোখে খুরের ধার কাঁচরাম পণ্ডুর কাছাকাছি এসে বলে, কি মিতে কি ভাবছ অতো?

পণ্ডু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সামনে বিশাল গভীর সমুন্দুর ভাই। পার হবো কেমন করে?

কাঁচরাম বলে, সমুন্দুর তোমার আমার সবার সামনেই থৈ থৈ করছে।

সকলকেই পরীক্ষা দিতে হবে। কঠিন পরীক্ষা। ভবানী বাঁড়ুজ্যে কাউকে বাঁচতে দেবে না। ও বাবা মানুষ-খেকো বাঘ। মনে আছে পাঁচু মোড়লের কথা?

আছে বৈকি।

কচিরাম যেন বাঘকে থোড়াই কেয়ার করে এমন ভাব সৃষ্টি করে বলে, বউমা ওগুলো তুলে রাখ। ছেলেমেয়েদের দাও। আমি বন্ধুর সঙ্গে কথা বলি।

কেরোসিনের কুপির আলোর চারপাশে পঞ্চুর ছেলেমেয়েরা এসে বসে পড়ে। গামছা জড়ান ধামাটা কাছেই বসান ছিল। কচিরামের কথার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চুর বড় মেয়ে ধামাটা ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়। বাকি ছেলেরা সঙ্গে যায় ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে।

এতক্ষণ নির্বাক ছায়ার মত দাঁড়িয়েছিল চারুবালা। বিকাল থেকে ক্রমাগত ছেলেমেয়েদের চাপে জর্জরিত অবস্থায়। প্রায় দেড় প্রহর রাতে স্বামীর অকৃত্রিম বন্ধুর এই প্রাণখোলা ব্যবহার দেখে সে মুগ্ধ। ছেলেমেয়েদের মুখে কিছু দিতে পারবে এই ভরসায়। আজকের দিনে কৃষক পরিবারের মেয়েরা খাবার তৈরি করতে ঢেঁকিশালে সারাটা দিন দলবদ্ধভাবে কাটায়। হাসি ইয়ারকি মস্করায় ঢেঁকিশালা জমজমাট হয়ে ওঠে, তার কোনটাই এলো না চারুলতার কাছে। শরীর খারাপের অজুহাত তৈরি করে চারুলতা পড়ে থেকেছে দাওয়ায়। ছেলেমেয়েরা কেঁদেছে। বলেছে, কই তোমার অসুখ মা, তোমার গা তো ঠাণ্ডা। বড় মেয়ের বুদ্ধি বেড়েছে। সে বলেছে, সব অসুখেই কি গা গরম হয় রে—

ধামাভর্তি খাবারের মধ্যে 'মিতে-মিতেনীর' আস্ত দরদী মনখানা এসে হাজির। তাই অজস্র দুঃখের মধ্যেও হাল্কা বাঁশির সুর যেন কানে আসে চারুলতার।

কচিরাম পঞ্চুকে বলে, তোমার গাদাটা পোষ-পাব্বনের আগেই ঝাড়তে হয়েছে বলে দুঃখু। আমাদেরগুনো পাব্বনের পরেই ঝাড়বো। আমাদেরও এই একই হাল হবে ভাই। 'হিসাব নিকাশ যব, শির ফাটেগা তব।' দুদিন আগে আর পরে। ওটা আসল কথা নয়। আসল ব্যাপারটা বলচি ভাল করে শুন।

কনকনে শীতের রাত। হু হু করে উত্তুরে বাতাস বয়ে চলে। মাঝে মাঝে শীতের জ্বালায় শিয়াল আর পেঁচা ডাকছে আশেপাশে। কচিরাম বলে যায়, ভাগীরথী তীরে সুবিস্তৃত চরে আগামী দিনে কি বিপর্যয় ঘটতে চলেছে। যে জমিতে প্রায় পাঁচশো জন চাষী অগ্রিম টাকা দিয়ে চাষবাস করে তা আসলে

ভবানীবাবুদের জমি নয়। এক ইংরেজ কোম্পানী জমি কিনেছিল ফ্যাক্টরী করার জন্যে। যে কোন কারণেই হোক তাড়াতাড়ি ফ্যাক্টরী হয়ে ওঠেনি। কোম্পানীর এটর্নী জমি দেখাশোনা করতে দেন ভবানী বাঁড়ুজ্যেকে। ভবানীবাবু বাৎসরিক সামান্য টাকা দিয়ে প্রায় দু'হাজার বিঘে শালি জমি দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে নেন। তাই চাষীদের কোন স্বত্ব যাতে না হয় সে ব্যবস্থা পাকা রেখেই জমি বিলি করেছেন ভবানীবাবু। যখন ইচ্ছা উচ্ছেদ করে দিতে পারবেন এমন এক্তিয়ার আছে তার।

অগ্রিম-জমায় চাষ করে চাষীরা। বিঘা প্রতি জমার-টাকা মোটা অঙ্কের। এই উপার্জন ভবানীবাবুর নিজস্ব প্রজাবিলি জমির উপার্জনের থেকে অনেক গুণ বেশি। ভবানীবাবু এই আয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি বানায় কলকাতায়। তখন থেকে তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়, ওটা আমার লক্ষ্মী-জমি। সোনার খনি। আর চাষীদের মধ্যে কথাবার্তায় বেরিয়ে আসে, আরে ভাই ঠিকের জমি নিকের মাগ। এই আছে এই নেই। আগুড়ি টাকা দিয়ে জমি কচ্চি এ সালে। বেশি টাকা দিয়ে আর সালে অন্য কেউ নিয়ে নেবে। হায়রে কপাল!

কচিরাম আজ ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে, আইন পাল্টেচে। জমিদারদের সমস্ত জমি সরকার নিয়ে নিয়েচে। মাঝখানে স্বত্ত্ব নেই। চাষীদেয় নামে প্রজাস্বত্ত্ব লেখা হবে। মাঠ জরিপ হবে। ভবানীবাবু কাছারিতে বলা-কওয়া করেচেন। বিনোদবাবু বল্লেন, জমিতে যে যেখানে আচিস চুপচাপ বসে থাক। তোদের একটা দিন আসচে।

পঞ্চু ফিকে হাসি হাসে। বলে, আমাদের দিন আসবে মিতে? কথাটা বিশ্বাস করতে হবে?

হাঁ-হাঁ। চিরটা কাল কি একই রকম যাবে নাকি?

॥ ৩ ॥

শতদ্রু বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকে নদীর ধারে। কদিন প্রচুর নৌকো লোকজন ভর্তি হয়ে সাগরদ্বীপে যাচ্ছে। বিহার উত্তরপ্রদেশের পুণ্যার্থীরা সংখ্যায় বেশি। স্থানীয় লোকজন নিয়ে কিছু ছোট নৌকোও যাচ্ছে। বাইরের নৌকোগুলো আকারে আয়তনে বড়। এখানকার ভাষায় নাম 'ভড়'। যাবার পথে রায়পুর গঞ্জে থেমে কেনাকাটা করছে। চুলো

জ্বালিয়ে রান্নাবান্না করছে মেয়েরা। নদীর জলে স্নান আহ্নিকে ব্যস্ত বয়স্ক পুণ্যার্থীরা। মকরসংক্রান্তির স্নানের জন্যে কপিল মুনির আশ্রমের দিকে চলেছে সবাই। ফেলে আসা কলকাতা শহরের কথা বলছে অনেকে। যাবার সময় আবার কলকাতায় নৌকো থামিয়ে মা-কালী দর্শন করবে। চিড়িয়াখানা দেখবে। কলকাতা বড়িয়া শহর।

শতদ্রু ভাবে এই পথেই ভগীরথ উত্তাল জলস্রোত নিয়ে সমুদ্রের দিকে ধাবমান হয়েছিলেন। সাগর রাজার ষাট হাজার ছেলে প্রাণ ফিরে পেয়েছিল। আহা! কি সুন্দর উপাখ্যান। জলের অভাবে এখানকার চাষীরা জ্বলে পুড়ে মরছিল। চাষ হচ্ছিল না। ভাগীরথীর পবিত্র স্রোতধারা সেই অভাব দূর করে দেয়। শস্যশ্যামলা হয়ে ওঠে অহল্যাভূমি! প্রাণ পায় এখানকার কৃষক-কুল। পাশাপাশি তার মনে হয় টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস নদীর ধারে মেসোপটে-মিয়ার কথা। মনে হয় হোয়াংহো ইয়াংসিকিয়াং নদীর কথা। নীলনদের অববাহিকায় মিশর দেশখানা দাঁড়িয়ে আছে। আগেকার দিনের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এই নদীগুলিকে কেন্দ্র করে। এ ছাড়া কোন বিকল্প রাস্তাই ছিল না। সিন্ধু সভ্যতার মূলেও সিন্ধু নদের দান। হিমালয়ের বরফগলা জলের প্রবাহ।

গঙ্গাদেবীর প্রতিমা পুজো হচ্ছে। গঙ্গাদেবীর মূর্তির সামনে দৃপ্ত যুবক ভগীরথ। তার সারা অবয়বে দ্রুতলয়ের ছন্দ। সাড়ম্বরে চলেছে এই পুজো। এখানে গঙ্গা পুজোকে সামনে রেখে চলবে এক মাসের মেলা। আনন্দ উৎসব। এর কারণ খুঁজতে দূরে যেতে হয় না। চাষের সাফল্য আর তাকে কেন্দ্র করে চাষীর উৎসব। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই উৎসব হচ্ছে বিভিন্ন নামে। বিভিন্ন কায়দায়। ভাবতে বেশ সুন্দর লাগে, ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণ পূর্ব থেকে পশ্চিম অঞ্চলের দূরত্ব কম নয়। ভাষা পোষাক ভিন্ন ধরনের। তবু কি অদ্ভুত মিল আছে তাদের উৎসব আনন্দের মাঝখানে। কপিল মুনির আশ্রমের সামনে নানা ভাষা নানা পোষাকের মানুষ একত্রিত হবে। বলবে, জয় কপিল মুনিজীকী জয়।

এই ঐক্যের ছবি চোখের সামনে দেখে শতদ্রু। এটা ভারতের সর্বক্ষেত্রে হয় না? হলে এত লাঠালাঠি মারামারি রক্তপাত থাকে না। আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে শতদ্রুর মন। তার মনের পরিধি বিস্তৃত হয়। সাগর রাজার ষাট হাজার ছেলে আজ রাম-রহিমের সন্তান। সবাইকে বাঁচাবার লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছিলেন মহাতপস্বী ভগীরথ। আজকের দিনে যে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী

মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে সেই বিষধর সাপটাকে ঘৃণা করে শতদ্রু। মনে মনে ভয়ও করে যথেষ্ট। বিগত দিনের ইতিহাস তো তার চোখের সামনে উন্মুক্ত।

আজকের পৃথিবী সম্পর্কেও একটা মোটামুটি ধারণা জন্মেছে শতদ্রুর। সৃষ্টির পর থেকে মানুষ এলোমেলোভাবে তাদের ঘামের বিনিময়ে পৃথিবীর ওপরকার রূপ পাল্টেছে। বাঁচার একটা ব্যবস্থা করতে হবে এই ভাবনা ব্যক্তি-বিশেষের মাথা থেকে গোষ্ঠীর মাথায় এসে প্রবেশ করেছে। কত দল তৈরি হয়েছে। পৃথিবীর নানা প্রান্তে তৈরি হয়েছে ধর্মের শিবির। এই শিবিরে মানবগোষ্ঠীর কত দল উপদল এসে যোগ দিয়েছে শুধু বাঁচার তাগিদে, পৈতৃক প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখার একান্ত আগ্রহে। দিন এসেছে। দিন গেছে। কত সংঘর্ষ হয়েছে ধর্মে ধর্মে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

ধর্মের আসল কথাগুলো আজ বড় অস্পষ্ট হয়ে গেছে। মানুষ মানুষের থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। সবাই বাঁচতে চায়। বাঁচার জন্যে হাঁটছে! পোষাকী ধর্মচিন্তাটা মাঝে মাঝে পত্র-পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হচ্ছে বা আলোচনার সময় আলোচনার বিষয়বস্তু। কিছু মানুষ উন্মাদের মত ছোটাছুটি করছে। ধর্মের অন্তস্থলে রাষ্ট্রজয়ের চিন্তা আগেও যেমন দেখা গেছে আজো দেখা যাচ্ছে। বীভৎস তার রূপ। ধর্মের মুখোশ পরে আজো কোথাও দলগতভাবে কোথাও ব্যক্তিগতভাবে চলেছে স্বার্থসিদ্ধির পালা।

নদীর তীরে প্রশস্ত চর। গঙ্গা পুজোর মেলায় সার্কাস ম্যাজিক পতুল নাচের আসর তৈরি হয়েছে। দেবী মূর্তির সামনে সুবিস্তৃত স্থানটি জুড়ে বিভিন্ন দিন যাত্রাপালার ব্যবস্থা হয়। আশপাশের গ্রাম থেকে লোকজন আসে এই মিলনকেন্দ্রে। এবছর পাশের 'চটকলের বাবুরা' একরাত গান বাজনার অনুষ্ঠান করবেন। মেলার সম্পাদক রাজি হয়েছেন এই প্রস্তাবে। আগামী রবিবার শতদ্রুকে ডেকেছেন মেলা কমিটির সম্পাদক। গানবাজনার দিন তাকে কিছু কাজকর্ম করতে হবে।

শতদ্রু প্রায় প্রতিদিন একবার মেলায় যায়। খুঁতিয়ে খুঁতিয়ে দেখে জিনিস-পত্র। পাথরের তৈরি বিভিন্ন ধরনের পাত্র। থালা-গ্লাস বাটি খোরাবাটি। এর পাশে হালফিলের তৈরি কড়ির কাপ ডিস বিভিন্ন আকারের পাত্র। খরিদ্দার দু'জায়গাতেই সমান। মাটির হাঁড়ি-কলসী সরা-মালসা কুঁজো-গামলার পাশে দোকান দিয়েছে এ্যালমুনিয়ামের বা প্লাসটিকের দ্রব্যসামগ্রী। সবাই হেঁকে-ডেকে মেলার লোকের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যস্ত। মাইক্রোফোনে প্রচার হচ্ছে দাঁতের

মাজন হাতকাটা-তেল হজমের-বড়ি অম্ল অজীর্ণ রোগের ওষুধের বিজ্ঞাপন। হাকিমী কবিরাজী ডাক্তারী সব শাস্ত্রের সমন্বয় হয়েছে এখানে। দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে খুঁজে নিতে হবে আপন প্রয়োজনীয় জিনিসটি। শতদ্রু হাসে। বড় শক্ত একাজ। তাই ভেসে চলেছে মানুষ এই মেলায়। জীবনের ক্ষেত্রেও এই একই ধরনের ছবি।

'মানুষের তিনটি মাথা। মানুষের কুকুরে মাথা। কাটা মুণ্ডু কথা বলে।' ছেলে ছোকরার দল হুমড়ি খেয়ে চুনকালি মাখা ক্লাউনের কথা শোনে আর কেরামতি দেখে। সার্কাসের প্যাণ্ডেলের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে জিরাপ। ভেতর থেকে বাঘ সিংহের গর্জন শোনা যায়। মাঝে মাঝে একজোড়া বাঁদর এসে সামনে দাঁড়ানো লোকেদের মজার কিছু দেখিয়ে ভিতরে চলে যায়।

শতদ্রু হেসে ফেলে ফটো তোলার দোকানের সামনে। একটা ছেলে সমানে চিৎকার করে যাচ্ছে, 'যেমনটি আছেন ঠিক তেমনটি উঠে যাবেন। দেয়ালে বাঁধিয়ে রাখবেন। ফটোক তুলুন। মা বোনেদের প্রিয়জনদের সঙ্গে নিয়ে চিহ্নত রাখুন। ফটোক তুলুন।'

কাঠের-বারকোস কেঠো লক্ষ্মীর সিংহাসন মসলা রাখার পাত্র দেরকো ডালের কাঁটা জিনিসপত্র নিয়ে খোঁচা খোঁচা দাড়ওয়ালা মিস্ত্রী বিড়ি টেনে যাচ্ছে। বলছে, আমার জিনিস নিয়ে হাঁকডাকের কোন দরকার নেই। যাদের দরকার আসবেন। নেবেন। চলে যাবেন।

দরদাম করতে করতে অস্থির হয়ে পড়ছে খেলনা ব্যবসায়ী। প্লাস্টিকের খেলনা কিনতে অসংখ্য খুদে খদ্দের ঝুঁকে পড়েছে। বিক্রিও হচ্ছে। এখানকার খদ্দেররা দরদাম করতে করতে চলে যাবার পাত্র নয়।

শতদ্রু হাসে। হুমড়ি খেয়ে মেয়েরা দেখছে চুড়ি টিপ ঘর-সাজানোর জিনিস। আয়না চিরুনি মাথার-কাঁটা ঝুটো-মুক্তোর-মালা পিতলের-হার। হাতে নিয়ে দেখার কত রকম কায়দা তাদের। কেউ কেউ দূর থেকে এ দৃশ্য দেখে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। চোখে ছলছল ভাব।

মেলার একধারে বসেছে জুয়ার আড্ডা। গোল হয়ে বসে আছে একদল মানুষ। দাঁড়িয়ে আছে একদল। এরা মাঝে মধ্যে পয়সা ছুঁড়ে কোন ঘরে বসাতে বলে দিচ্ছে। বাটি নেড়ে উপুড় করে বসাচ্ছে একজন। বাটি ওঠানোর পরে হারজিৎ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। ক্রমাগত হারছে বেশির ভাগ কিন্তু আঠার মত সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে সবাই।

এর পাশেই নদীর ধার ঘেঁষে কাঠের আসবাবপত্রের দোকান। খাট টেবিল চেয়ার চৌকি টুল আলনা আলমারি সাজান। একজন তার স্বামীর কাছে আবদার শুরু করেছে, আমায় একটা ড্রেসিং টেবিল কিনে দাও। এতে চুল বাঁধার খুব সুবিধে। স্বামী হাসছে। ধীরে ধীরে কি বোঝাবার চেষ্টা করছে। নতুন বৌকে সহজে বোঝান যাচ্ছে না সহজ ব্যাপারটা।

যাত্রা আসরের পাশে সারি সারি ময়রার দোকান। চাপড়ান-পরটা জিলিপি খাস্তার-গজা রসগোল্লা পানতুয়াও আছে। তবে ভিড় করছে পরটা কেনার খরিদদার। দূর থেকে পায়ে হেঁটে আসা মানুষ একটু না খেলে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাবে কেমন করে? তাছাড়া সবাই মিলে বসে ভোজনসুখ উপভোগ করার জন্যে কত আগে থেকে স্বপ্ন দেখে ওরা। কত কষ্টে পয়সাগুলো জমায়। আজ রীতিমত দিল-দরাজ। মা সস্নেহে বলেন, আর একটা গজা খানা বাবা—

না তিনটে তো খেনু—

তা হোক আর একটা নে।

বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দোকানদারের চৌকশ কর্মচারী শালপাতার ঠোঙার ওপর টপ করে একটা গজা ফেলে দেয়।

খেতে খেতে সবাই দেখে বিরাট মসৃণ সাদা পাথরের ওপর বেলুন দিয়ে প্রচণ্ড তৎপরতার সঙ্গে পরটা বেলে চলেছে সারি সারি কয়েকজন। তিনজনে ভেজে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। চাটু থেকে ভাজা পরটা উঠিয়ে বেশ কয়েকবার সশব্দে চাপড়ে নেয়। ব্যাস।

মেলার সময় পরটা জমিয়ে রাখার সুযোগ হয় না। হু হু করে উঠে যায়।

বাদাম-ভাজা মক্কা-ভাজার বিক্রেতারা 'সাণ্ডা' দিয়ে কড়াইয়ের বাদাম মক্কা ওল্টায় আর হাঁকতে থাকে, গরম ই দিকে—গরম গরম—

শীতের সন্ধ্যায় একটা আজব দুনিয়া দেখা যায় মেলায় এলে। শতদ্রু তা খুঁতিয়ে খুঁতিয়ে দেখে। একটা কথা তার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, মানুষের চিন্তা ভাবনার এক অসম বিকাশ সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থার ভিতর তালগোল পাকাচ্ছে। যার অনিবার্য ফল হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল লক্ষ্য শুভ বস্তুটি হাজার রকমের কালমেঘে আচ্ছন্ন। এমন পরিবেশে সামাজিক কল্যাণ অসম্ভব।

জড়িবুটি নিয়ে বসা সাধুর কাছে বেশ ভিড়। ভিড় অম্লঅজীর্ণ রোগের ওষুধ কেনার। এক হাকিম সাহেব বিক্রি করছেন ওষুধ। গুণাগুণ বর্ণনা

করে। সেখানেও কি লোক কম আছে!

গঙ্গামূর্তির এক পাশে কালীমূর্তি। এখানে মানসিক পুজো দেবার ভিড়। অভিষ্ট-সিদ্ধ পুত্র লাভ ইত্যাদির জন্যে পাঁঠাবলি থেকে শুরু করে ধামা ধামা বাতাসা সন্দেশের নৈবেদ্য। ফলমূল রাশি রাশি। এছাড়া মাটির 'শলন' মূর্তি এনে মায়ের কাছে নিবেদন করছে পুত্র লাভ করেছেন যিনি। নদীতে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে গামছা জড়িয়ে গন্ডী কাটছে। চিন্তা-ভাবনা-বুদ্ধি ঘূর্ণি ঝড়ের মত আবর্তিত হচ্ছে। সেই আবর্তের মহাশক্তির কাছ থেকে মুক্তি পাওয়া খুব শক্ত।

॥ ৪ ॥

বাবা পুরোহিতের কাজ করেন। আয় যৎসামান্য। এর মধ্যে চলে সংসার। রাজেশ্বর তর্করত্নের এর জন্যে কোন দুঃখ নেই। প্রথম প্রথম রাজেশ্বরের নির্বিকার মূর্তি দেখে ক্ষীণ প্রতিবাদ করেছে সর্বাণী। কিন্তু প্রতিবাদই সার। কোন ফল পাওয়া দূরের কথা এতটুকু আঁচড় কাটেনি রাজেশ্বরের মনে। তার প্রশান্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছে সর্বাণী। এ এক মানুষ! কেনই বা এরা সংসার-ধর্ম করে? কোন দিকে লক্ষ্য নেই। ক্ষয়ক্ষতি লাভ-প্রাপ্তির মধ্যে এতটুকু ভাবান্তর পর্যন্ত দেখা যায় না। তাই সর্বাণীর একান্ত ইচ্ছা—শতদ্রু বাবার পেশায় না গিয়ে ভিন্ন কাজকর্ম করে শান্তি পাক।

শতদ্রুর ইচ্ছা বিস্তৃত জগতের কর্মকাণ্ডের পাশে পাশে থেকে আঁচ পাবে সব কিছুর। বুঝতে চায় সব কিছুকে। এর বেশি আশা করতে পারে না সে। স্কুলের প্রদর্শনীতে এক তরুণ শিল্পী একটা ছবি এঁকেছিল। ভাঙা ডিমের ওপরে বসে একটা পাখির বাচ্চা হাঁ করে তাকিয়ে আছে মহাবিশ্বের দিকে। দু চোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে! পরে অবশ্য শতদ্রু খবর পায় এ ছবিটা এক বিখ্যাত চিত্রকরের আঁকা। যাহোক শতদ্রুর মনে দাগ কেটেছিল এই ছবিটা।

কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। গ্রামের হাট মাসখানেক মেলাতেই বসবে। তাই মাছ-মাংস শাক-সব্জী সবই আছে মেলায়। মা কি চমৎকার রান্না করতে পারেন। কিন্তু আনাজ-পত্র কিনে দেবার ক্ষমতা নেই বাবার। একসঙ্গে এক সের আলু কোনদিন কিনতে পারে না। কত রকমের শীতের আনাজ বাড়ি বাড়ি কিনে আনছে। কিন্তু শতদ্রুরা ওসব কিনতে পারবে না। কপি-টমেটো-

শশাটি আরো মাসখানেক পরে তারা হাঁড়িতে তুলতে পারবে। এখন অল্প আলু বেগুন কিনেই বাজারপর্ব শেষ করতে হবে।

আজ বিকালের দিকে অহেতুক মনে একটা ধাক্কা খায় শতদ্রু। অন্যান্য দিনের মত নদীর ধারে দাঁড়িয়ে থাকে সে। সূর্যাস্ত দেখে। পাশের জুট মিলের কেরাণীবাবুদের একপাল ছেলেমেয়ে নদীর বাঁধ ধরে চেঁচামেচি করতে করতে বাড়ির পথে হাঁটে। কেউ বাঁশি বাজায়। কেউ ছোট্ট ঢোলকে চাঁটি মারে। কেউ বেহালায় সুর তোলে। একজন চিৎকার করে ওঠে, এই ভাবুক—এই ধ্যান-গম্ভীর—আরে এদিকে একটু তাকাও।

শতদ্রু মুখ ফেরায়। সঙ্গে সঙ্গে স্কার্ট ব্লাউজ পরা প্রায় তারই বয়সী একটা ফুটফুটে মেয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে। বলে, ধ্যান ভেঙেছে রে—। দলের আর সবাই খিলখিল করে হেসে ওঠে।

ওদেরই একজন বলে, তুই ধ্যান ভঙ্গ করলি। আহা রে—

আবার হাসির ফোয়ারা ওঠে মেলা ফেরৎ ক্ষুদে দলের মধ্যে।

শতদ্রু প্রথমে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেলেও পরক্ষণে স্কার্ট ব্লাউজ পরা মেয়েটির মধ্যে 'একগুচ্ছ শুভ্র কুসুমের' সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়। এটাও ওদের কাছে রীতিমত উল্লাস সৃষ্টি করে।

'মুগ্ধ দৃষ্টি। খুব সামলে উর্বশী। ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেছে।' একজন রীতিমত বিদ্রুপের ভঙ্গীতে কথাগুলি বলে।

আবার ওঠে হাসির রোল।

ওরা চলে যায়। কথা ভেসে আসে। 'আজ রীতিমত মজা করা গেল।' ঝড়ের মত এসে চলে গেল ওরা।

শতদ্রুর চিন্তা মোটামুটি আন্দাজ করার চেষ্টা করে এদের আজকের ব্যবহারটা। অহেতুক খোঁচা দিয়ে আমোদ পেতে চাইল ওরা? কাউকে আঘাত দিতে এতটুকু বাধে না এদের? অপরকে আঘাত দিতে গিয়ে নিজের অস্তিত্ব কতটা বিপন্ন হয় তার হিসাবও করে না এরা। ভাগীরথীর স্রোতে ভাসা টোকাপানার মত ভেসে যাচ্ছে। নিজস্ব লক্ষ্য উদ্দেশ্য বলে কিছু নেই। এর মধ্যে একটা কথা স্মরণ করে হেসে ফেলে শতদ্রু। সে মুখ ফেরাতে 'শুভ্র কুসুম গুচ্ছ' তার দিকে তাকিয়ে ভেংচি কেটেছিল। কথাটা অনেকক্ষণ ভাবে শতদ্রু। চলে যাওয়া মানুষের ক্ষণিকের মুখভঙ্গী এমনভাবে মনের মধ্যে

খোদাই হয়ে যেতে পারে, তা ভাবতেই পারে না সে।

মেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দিন এগিয়ে আসছে। সেদিন বিকালবেলা শতদ্রু কলেজ থেকে বাড়ি এসে পৌঁচেছে। সর্বাণী ব্যস্তসমস্ত হয়ে খবর দেয়, মিলের একটা দারোয়ান এসে চিঠি দিয়ে গেছে। তোকে বোধ হয় একটু বেরুতে হবে।

মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে গ্রামের দু'এক জনের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল জুটমিলের কেরানী বাবুরা। পাড়ার সবাই বলে দিয়েছে শতদ্রুর সঙ্গে কথা বলতে। তাই এই ডাক।

একটু খেয়ে নিয়ে বার হয় শতদ্রু। এর আগে কোন দিন সে কেরানী বাবুদের ক্লাবে যায়নি। আজ প্রথম পা ফেলবে। সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ। নতুন জায়গা। নতুন লোকজনদের সামনে উপস্থিতি। জ্ঞানদাময়ী বার-বার বলেন, দূর থেকে দেখে কোন জিনিস সম্পর্কে ভাল মন্দ কিছুই বোঝা যায় না। সামনে এগিয়ে যেতে হয়। সব জিনিস তন্ন তন্ন করে দেখতে হয়। ভয়-ভাবনা কেটে যাবে এতে। একটা পথ মিলবেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভাগীরথীর জলে অজস্র ছোট বড় ঢেউ। তার ওপর একপাল জেলে-নৌকো নৃত্যরত। 'থর' ধরা নৌকোগুলো দুপাশে 'বেংদি জাল' ধরে অপেক্ষা করছে। মাথার ওপর বিশাল আকাশ। মনটা আজ খুবই প্রসন্ন।

শতদ্রু সোজা ক্লাব ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। ভেতর থেকে একজন বেশ ভারি গালায় ডাকে, এসো—

শতদ্রু এগিয়ে যায়। আধুনিক কায়দায় সাজান ঘরখানা আর দেয়ালের ছবিগুলো একবার দেখে নেয় শতদ্রু। রীতিমত তড়িৎ গতিতে। ঘরের মাঝখানে বিছান শতরঞ্চির ওপর বসে পড়ে। একপাল মেয়ে আর কিছু ছেলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে এখানে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা 'শুভ্র কুসুম গুচ্ছ' বসে আছে এদের মধ্যে। আজ তার মুখে কোন রকমের চাঞ্চল্য বা চপলতা নেই। সে শাড়ি পরে এসেছে আজ।

মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক বলেন, তোমাদের গ্রামের মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। গ্রামের লোকের মতে তুমিই তাদের প্রতিনিধি। তাই অনুষ্ঠান ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমরা একটু আলোচনা করে নোবো।

একজন মধ্যবয়সী মহিলা বলেন, উনি ক্লাবের পুরুষ বিভাগের সম্পাদক সমীর ঘোষ আর আমি মহিলা বিভাগের সম্পাদিকা নীলিমা সেনগুপ্ত। হাত

জোড় করে নমস্কার জানায় শতদ্রু। মৃদু হেসে বলে, গ্রামে থাকি। এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা একেবারেই নেই। গ্রামের সংস্কৃতি হরিনাম সংকীর্তন। বছরের শেষে বাউল গানের উৎসব। গাজন-মেলা এই সব।

নীলিমা বলেন, এই সব জিনিস সাংস্কৃতিক জগতের খুবই গভীরে শতদ্রু। লক্ষ লক্ষ নাম-না-জানা শিল্পী এর মহান ধারাকে প্রবাহিত রেখেছেন।

তা তো জানি, ভাদু টুসু গম্ভীরা ইত্যাদিকেও তো সাংস্কৃতিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বাউল কীর্তন ভাটিয়ালী তো আগেই স্থান করে নিয়েছে সাংস্কৃতিক দুনিয়ায়।

সমীর বসু আর নীলিমা সেন শতদ্রুর কথা বলার পদ্ধতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেন। আর লক্ষ্য করেন সাংস্কৃতিক জগতের কিছু-কিছু খোঁজ-খবর রাখে ছেলেটি।

'শুভ্র কুসুম গুচ্ছ' নদীর তীরে আত্মভোলা সেই ছেলেটিকে আজ সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিতে দেখে আর পরিতাপ করে ওদিনকার মূল্যায়নে কত ভুল ছিল তাদের। এমনি কত শত ভুল প্রতিদিন ঘটে যাচ্ছে জীবন-পথে।

সমীর বাবু আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলেন, একটা কর্মসূচি তো তৈরি করতে হবে।

নিশ্চয়। কথার মধ্যে সহজ গাম্ভীর্য এনে বলে শতদ্রু।

সবাই তাকিয়ে থাকে শতদ্রুর দিকে। এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে নিয়ে সমীরবাবু বলেন, কিছু গান কয়েকটা আবৃত্তি কয়েকটা হাস্যরস—এই হলেই মোটামুটি হয়ে যাবে।

তাই করুন। সঙ্গে পুরো নাটক হয়ত সম্ভব হবে না কিন্তু কিছু নাট্য চরিত্রকে উপস্থিত করলে কেমন হয় দেখবেন। উপস্থিত জনসাধারণের একটা বড় অংশ নাটক দেখতে ভালবাসে। বলে শতদ্রু।

'শুভ্র কুসুম গুচ্ছের' নাম সুস্মিতা। শতদ্রুকে সে আজ খুঁতিয়ে খুঁতিয়ে দেখে। ওর চোখ দুটোর মধ্যে কি যেন আবিষ্কার করতে চায়। শতদ্রুর দুটো চোখ সারা মুখখানাকে এক অস্বাভাবিক সৌন্দর্য দিয়েছে। তাদের শিল্প শহরের পাশের গ্রামে এমন একটা ছেলে থাকতে পারে সে বিশ্বাস করতে পারে না।

সমীরবাবু বলেন, কি নাম যেন তোমার?

শতদ্রু।

খাতা কলম নাও শতদ্রু। কে কোন গানটা করবে লিখে নাও।

সুস্মিতার পাশে বসে নীলিমা সেন নাম বলে যান। শতদ্রু লিখে যায়। সুস্মিতা শতদ্রুর কাছাকাছি এগিয়ে আসে। লেখার দিকে চোখ রেখে বলে, চমৎকার। মুক্তোর মত অক্ষর।

শতদ্রু এতটুকু বিচলিত না হয়ে বলে, কি এমন—

লেখার শেষে আরো কিছু কাজের ঠিক হয়ে যায়। গানগুলোর আগে ছোট্ট একটা করে ইতিহাস বা পরিচিতি যোগ করে দিলে কেমন হয়? গ্রান্থিক হিসাবে একজন ওগুলো পড়ে দেবেন। তাতে গানের গাম্ভীর্য বাড়বে। সবাই একবাক্যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেন। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি লিখবে কে? সবাই এ ব্যাপারে এড়িয়ে যেতে চায়। শেষ পর্যন্ত শতদ্রু বলে, আমি লিখে দিতে পারি যদি কেউ তথ্য দিয়ে সাহায্য করেন। তাছাড়া অধ্যাপক গোস্বামীর থেকে আমি সাহায্য পেতে পারি। উনি আমায় খুব স্নেহ করেন।

নীলিমা বলেন, তুমি ভাইটি আমার বাসায় এসো। সমস্ত গান আর যতটা পারি তথ্য আমি যোগাড় করে দোবো। বাকি কাজটা করতে হবে তোমাকে।

ঠিক আছে। আমি আপনার বাসায় আসবো।

শতদ্রু চলে যাবার পর সমীরবাবু বলেন, আমরা খুব আণ্ডার এস্টিমেট করেছিলাম পাশের গ্রামের লোকজনদের সম্পর্কে। ওখানেও যে রুচি সচেতন লোক থাকতে পারে এটা আমাদের জানার বাইরে ছিল।

নীলিমা বলেন, ছেলেটি শুধু ভাল নয়। খুব ভাল। আপনি বলেছিলেন স্টেজে হারমোনিয়াম বয়ে নিয়ে যাবে। তবলা উঠিয়ে আনবে এই ধরনের সহযোগিতা করতে পেলে বর্তে যাবে এমন ধরনের কেউ আসবে নিশ্চয়। কিন্তু এখন এমন ছেলে এসে উপস্থিত হয়েছে যে আমাদের সঙ্গে বসেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এটা আনন্দের কথা।

সুস্মিতা নীলিমার মুখের দিকে এক বিশেষ ভঙ্গীতে তাকিয়ে বলে, দেখুন নীলিমাদি কষ্ঠিপাথর দিয়ে পরখ করার আগে কারো সম্পর্কে কিছু না বলাই ভাল। আমার এক বিরাট শিক্ষা হয়ে গেল।

নীলিমাদি বিস্ময়মিশ্রিত স্বরে কপাল কুঁচকে বলেন, কি শিক্ষা হলো তোমার?

শতদ্রুবাবুকে রাস্তায় পেয়ে একদিন কি অপমানটাই না করেছি। আমরা ওকে খোঁচা দিয়ে দল বেঁধে আমোদ করেছি। ভদ্রলোক টুঁ শব্দটি করেন না।

আজ দেখলাম অজ্ঞ-গ্রাম্য-মাকালফল যুবক ভেবে যাকে নিয়ে মস্করা করেছি শিক্ষাদীক্ষায় চিন্তাভাবনায় তিনি আমাদের থেকে কম যান না। আমার ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত।

উপস্থিত সবাই একবাক্যে বলেন, এটা খুবই উচিত কাজ হবে।

সমীরবাবু বলেন, বিষয়টা কি জানি না। তবু বলবো এটাই ঠিক।

পরের দিন অনেকক্ষণ বিভিন্নমুখী আলোচনা চলে। শতদ্রু রীতিমত মুন্সীআনা দেখিয়ে এসব বিষয়ের আলোচনায় ভাগ নেয়। অথচ প্রতি মুহূর্তে দেখাতে চায় এমন-কিছু সে জানে না। এটাকে ঠিক বৈষ্ণব বিনয় বলা যাবে না। এর মধ্যে থেকে যায় এক রুচিসম্মত উন্নত মানসিকতার লক্ষণ।

ভাগীরথীর জলরাশির পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলে শতদ্রু। কলেজে যাবার সময় টিফিনের কৌটোয় মা খাবার ভরে দেন। কৌটো এনে মা বলেন, অনেক কিছু জানার আছে বাবা। জানতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে। ডোবার জলের মত পড়ে পড়ে পচে গেলে চলবে না। দুরন্ত সমুদ্রের ঢেউয়ের মত হতে হবে। শতদ্রু এগিয়ে যায়। মা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন বাড়ির সামনে। যতক্ষণ দেখা যায় দেখেন। জীবনের সাধ আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীককে।

জ্ঞানদাময়ীর কথা মনে এলেই শতদ্রুর কানে কয়েকটা কথা বাজতে থাকে, এই বুকে দারুণ ব্যথা ভাই। অনেক কাহিনী তোকে বলেছি। গাঁয়ের গরীব মানুষকে তিলে তিলে পিষে মারে একদল মাতব্বর। তাদের নৌকোর দড়ি বড় গাছে বাঁধা থাকে। তাই কাউকে পরোয়া করে না। মানুষ হয়ে এর প্রতিবিধান করিস ভাই।

মাইল তিনেক হেঁটে খেয়া পার হতে হয়। কলেজে যেতে হলে রীতিমত শারীরিক কসরতের দরকার। মনের দিক থেকে কিন্তু এতটুকু ক্লান্তি অনুভব করে না শতদ্রু। বিকেলবেলা ফেরার পথে অবশ্য তার খুব জোর খিদে পায়। পেট জ্বলে যায়। আজ কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে খেতে হবে। নীলিমা সেনের বাড়ি যাওয়া দরকার। সময় করে নিতে হবে।

শ্যামলা রঙের মেয়ে নীলিমা সেন। ভারি মিষ্টি। ওকে দিদি সম্বোধন করে মনটা রীতিমত পরিতৃপ্তি লাভ করে। শতদ্রুর নিজের দিদি নেই। অতি অল্প সময়ের মধ্যে নীলিমাদি কেমন যেন আপন করে নেয় তাকে।

হাঁটতে হাঁটতে মিলের চিমনিটা এগিয়ে আসে। আর একটু এগিয়ে গেলেই নীলিমাদির বাসা। কোয়ার্টার নম্বর বলে দিয়েছেন। দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলে শতদ্রু। বাসার কাছাকাছি এসে শতদ্রু দেখে, বাইরের ছোট বারান্দায় বসে আছেন নীলিমাদি। তার পাশে এক বৃদ্ধা। শতদ্রু আসার সঙ্গে সঙ্গে নীলিমাদি বলেন, এসো এসো ভাই, মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে। আগে মুখ হাত ধুয়ে নাও। মুখ ধোয়ার জায়গা দেখিয়ে দাও সুস্মিতা। আশ্চর্য হয়ে যায় শতদ্রু মেলা-দেখে আসার সময়কার সেই চপল মেয়েটি কোথায় হারিয়ে গেছে আজও।

মুখ হাত ধোয়ার পর সুস্মিতা একটা পরিষ্কার তোয়ালে শতদ্রুর হাতে দিয়ে বলে, মুখ হাত মুছে নিয়ে ভেতরে আসুন। একটু কিছু মুখে দিন। তারপরে তো কাজে বসবেন। কোন সাত-সকালে খেয়েছেন।

তা অবশ্য।

লেখার টেবিলের পাশে এসে বসেন নীলিমাদির মা। বলেন, আচ্ছা তোমাদের গ্রামের অজয়কে চেনো ?

কোন অজয়ের কথা বলছেন ?

স্বদেশী আন্দোলনের সময় ধরা পড়ে। এর পর যার কোন হদিস পাওয়া যায় না।

মাথা নীচু করে শতদ্রু বলে, উনি আমার কাকা।

তোমার কাকা !

হাঁ।

কোন জেলে রাখল বাছাকে, খবর পাওয়া গেল না। বাছা দুনিয়া থেকে চলে গেল। কজনই বা তাকে চেনে ! এমন কত সোনার চাঁদ ছেলে চলে গেল। পুলিশের ভয়ে আমার ঘরের কোণায় শুয়ে থাকত অজয়। আরো অনেকে থাকত। লবণ-আন্দোলনের সময় মালা-মণিরামপুর থেকে যারা আসতো, কাজ সেরে সবাই এখানে এসে শুয়ে থাকতো। সেদিন অজয় একা ছিল। তোমাদের গ্রামের ঘোষালদের বাড়ির কে যেন গোয়েন্দাগিরি করে পুলিশকে জানিয়ে দেয়। আমার সামনে থেকে ধরে নিয়ে যায় বাছাকে। আঁচল দিয়ে চোখ মোছেন বৃদ্ধা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, তোমার ঠাকুরমা বেঁচে আছেন ?

আছেন। যন্ত্রণায় পাথর হয়ে গেছেন।

তোমার বাবাও কম করেনি তোমার কাকার জন্যে। এ-বাড়ির কর্তার সঙ্গে

কথাবার্তা বলে পাঞ্জাব গিয়েছিল। চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ সালে। আগুনজ্বলা দিনে। তোমার কাকা লাহোরের জেলে আছে এমন একটা খবর ছিল আমাদের কাছে। আমার এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয় ছিল ওখানে। তার সঙ্গে যোগাযোগ করে খোঁজাখুঁজিও হয়েছিল যথেষ্ট। বাছার কোন খবরই পাওয়া যায়নি। রাজেশ্বরের কাছে পাঞ্জাবের কথা শুনেছে শতদ্রু। কিন্তু তিনি খুব চাপা প্রকৃতির লোক। কাউকে কিছু বলতে চান না। বলেন, বলে কি হবে? কে কি করবে? করার লোক খুঁজে পাচ্ছি না আজকাল। অনেক দেখলুম। মার খেলুম। বাস্তুচ্যুত হলুম। আর কি! আদর্শের জন্য নীরবে কাজ করে যাবার লোক তিনি।

কাকার কথাও শুনেছে শতদ্রু। অবিবাহিত অজয় আশ্রম তৈরি করেছিলেন আলমনগরে। এখানে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতারা আসতেন। গোপনে কাজ সেরে চলে যেতেন। 'গদর' পার্টি তৈরির সময় থেকে এখানে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত। বিপ্লবী রাসবিহারী বোস এখানে এসেছেন। এই সেদিন পর্যন্ত এসেছেন বিপিন গাঙ্গুলী। অনুরূপ সেন আসতেন বড়ুল স্কুল থেকে।

জঙ্গল থেকে ট্রেনরাস্তা পর্যন্ত পথটা ছিল বিপ্লবীদের কাছে খুব নিরিবিলি। লোকজন খুব একটা যাতায়াত করতো না এই পথে। তাই ট্রেন থেকে নামা। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক করা। তারপর কায়দা করে রাস্তাটা ধরে নেওয়া। গাঁয়ের লোক খুব শ্রদ্ধা করতো আশ্রমের লোকজনদের। তোমার কাকার গতিবিধি ছিল ভারতের সর্বত্র। অনেক বিপ্লবীদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। মুখখানা ছিল অদ্ভুত সুন্দর। চোখে মুখে নাকে কোন খুঁত ছিল না। পাড়ায় লোকে বলে, যাত্রায় একবার জগদ্ধাত্রী সেজেছিল। আসরের লোকজন হৈ হৈ করে উঠেছিল তার রূপ দেখে। গলার স্বরটা ছিল কি মিষ্টি! বৃদ্ধা আঁচল দিয়ে আবার চোখ মোছেন।

পাঞ্জাব থেকে ফেরার পর রাজেশ্বর তর্করত্নের মনে যে চিন্তা এসেছিল তার সঙ্গে পরিচিত নয় শতদ্রু। কিন্তু তার নামকরণের মধ্যে বাবা ছোট্ট একটা ইঙ্গিত রেখে গেছেন। এই ইঙ্গিতের মধ্যে যে বিশেষ চিন্তা লুকিয়ে আছে তা তার কাছে আজো অস্পষ্ট।

গানের আগে গৌরচন্দ্রিকার বিষয়বস্তু ঠিক করে নেয় শতদ্রু। এ ব্যাপারে

নীলিমাদি ছাড়া অধ্যাপক গোস্বামীর কাছে সে ভালই সাহায্য পায়। দেশাত্মবোধ সঙ্গীতের চালচিত্রগুলি খুব আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। অধ্যাপক গোস্বামী বলেন, তোর লেখার হাত আছে শতদ্রু। সমীরবাবু নীলিমাদিও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। নীলিমাদি মুগ্ধ হয়ে লেখা দেখেন। পাশে ঝুঁকে থাকে সুস্মিতা। পড়া শেষে নীলিমাদি বলেন, শতদ্রু সঙ্গীতানুষ্ঠানের গ্রান্হিক তুমিই হবে। সুস্মিতা ঘাড় নেড়ে বলে, খুবই মানানসই হবে।

সমীরবাবু বলেন, নিশ্চয়—এত কষ্ট করে দাঁড় করালে জিনিসটা। তুমিই পাঠ করবে। তোমার আবৃত্তিটাও ভাল। এমনভাবে পড়ার লোক আমাদের মধ্যেও কেউ নেই। তোমার লেখার হাতটাও দেখছি বেশ পাকা। তুমি লেখটেখ নাকি ?

না।

অভ্যাস কর। আমি বলছি তুমি একদিন নাম করবে।

প্রতিদিন শতদ্রু নদীর অফুরন্ত জলরাশির পাশ দিয়ে এগিয়ে যায়। মানুষের মাঝখানে এত প্রাণশক্তি আছে আবিষ্কারের মধ্যে এক নির্মল আনন্দ উপভোগ করে সে। নদীর বাঁধের-পাশের বড় বড় গাছগুলো অসংখ্য ডাল-পালায় ভরা। সবুজ পাতায়-পাতায় আচ্ছন্ন। জীবনের ক্ষেত্রে শাখা-প্রশাখা সবুজ পাতা না থাকলে শুধু কাণ্ডখানার কোন মূল্যই নেই। আর কাণ্ড-খানাই বা সৃষ্টি হবে কি করে, অজস্র ছোট ছোট পাতার সাহায্য না থাকলে ? গাছের সূক্ষ্ম শিকড়গুলো নিষ্ঠার সঙ্গে নীরবে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে। সেই কাজই প্রতি মুহূর্তে পূর্ণতা আনছে বৃক্ষ-জীবনে। জীবন সংগ্রামের এক নীরব মূর্ত-প্রতীক বৃক্ষ। আনন্দে গাছগুলোকে আজ জড়িয়ে ধরতে চায় শতদ্রু।

মিলের চিমনিটাকে সামনে রেখে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলে শতদ্রু। এক সময় পথের পরিধি কমে আসে। চোখের সামনে হাতছানি দেয় নীলিমাদির বাড়িখানা। মাধবীলতার শাখায় শাখায় সুসজ্জিত ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে সুস্মিতা। কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে সাদর আহ্বান জানায় শতদ্রুকে। 'আসুন আসুন মহারাজ—'

মহারাজ।

হাঁ। আপনি মহারজ। এই অল্প দিনে আপনি সবার মনে জায়গা করে নিয়েছেন।

পাশে এসে দাঁড়ায় প্রীতি। মিষ্টি হাসি হেসে বলে, ওর মনেও।

সুস্মিতা রক্তিম মুখে বলে, আগেই তো কবুল করে নিয়েছি। সবার মনে জায়গা করে নিয়েছেন আপনি। তার মানে কি? আমি বাদ এর থেকে?

শতদ্রু সুস্মিতার দিকে তাকিয়ে বলে, তোমার মনেও জায়গা করে নিয়েছি? সেই ভেংচিকাটা আর উপহাস করার কথা মনে আছে তো?

আছে। তার জন্যে আমি লজ্জিত। দুঃখিত। হলো তো?

এর পর আর কি কিছু বলা যায়?

সুস্মিতা প্রীতি দুজনেই এক রকম জড়িয়ে ধরে শতদ্রুকে। বলে, এই জন্যেই তুমি ভাল। খু-উ-ব ভাল। সব কথা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে পার।

ক্লাবে বসে নীলিমাদি বলেন, তোমার মত বয়েসে এই ধরনের ক্ষমতা দেখে বাবা রীতিমত মুগ্ধ। আমরাও তো নামকরা কলেজ থেকে পড়াশোনা করেছি। ভাল ছেলেমেয়ে দেখেছি। কিন্তু অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি তোমার গভীর-ভাবনা আর পরিমিত-বোধ দেখে আমরাও স্তম্ভিত। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তুমি যে জিনিস তৈরি করলে তা অল্প লোকেই পারে। আর আমাদের সঙ্গে ব্যবহারে আচরণে তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ রীতিমত মাপাজোখা।

ধীরে কণ্ঠে শতদ্রু বলে, আপনারা অনেক জ্ঞান-গুণের অধিকারী সেই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় এটা।

শতদ্রুর এই ধরনের বিনয় আর আচরণ দেখে মুগ্ধ হয় সবাই। সুস্মিতার শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত লয়ে বইতে থাকে। শতদ্রুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সে একদৃষ্টে। নীলিমা সেদিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নেয়। মুখ টিপে হাসে। পরক্ষনেই সংযত হয়ে বলে, ওদের পরিবারে অতুলনীয় গুণের অধিকারী এক স্বদেশপ্রেমিকের জন্ম হয়েছিল।

অনুষ্ঠানের দিন লাল-বর্ডার দেওয়া কাল কুচকুচে স্ক্রীনটা তোলার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় রাজেশ্বর তর্করত্নের পুত্র শতদ্রুকে মধ্যমণি করে একপাল ছেলেমেয়ে বসে আছে। তার মধ্য থেকে সমীরবাবু দুচার কথা বলেন। এর পর অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যায়। শিল্পীদের নাম ঘোষণার শেষে অনুষ্ঠানে গ্রাম্থিক হিসাবে শতদ্রুর নামও ঘোষণা করা হয়।

কাঁচিরাম পণ্ডু হারান গুলে নিতাইরা সামনে এসে বসেছে। ওদের বাড়ির

মেয়েরাও এসেছে। শতদ্রুর দিকে আঙুল বাড়িয়ে কি সব বলছে। সমীরবাবু বলেন, শতদ্রুকে দেখে ওরা খুব খুশি দেখতে পাচ্ছি। কারো মধ্যে কোন গুণ থাকলে সেটা সবার সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব আছে বইকি। আগেকার দিনে রাজা-মহারাজারা এ কাজটা করতেন। আজকে তো আর রাজা-মহারাজা নেই। তাই আমাদের ওপর অনেকটা দায়িত্ব এসে পৌঁচেছে।

একটার পর একটা গান হয়ে যায়। শতদ্রু আবেগকম্পিত গম্ভীর কণ্ঠে পাঠ করে যায় গানের উৎস-পট-চিত্র। গানের অন্তর্নিহিত ভাবধারা মূর্ত হয়ে ওঠে তার কণ্ঠে। নিশ্চুপ হয়ে শোনে সবাই।

শতদ্রু মাঝে মাঝে দেখে। এত সুন্দর দেখাচ্ছে আজ সুস্মিতাকে। লাল পাড় রেশমের শাড়ি পরা কি মিষ্টি চেহারা। নীলিমাদিকে দিদি বলে ডাকতে আজ প্রাণটা কেমন যেন আনচান করে। মনের এই ধরনের প্রবল তৃষ্ণা কিছু দিন যাবৎ বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করছে শতদ্রু।

বাড়িতে মা আজকাল বলেন, তোর মনটা বেশ খুশি-খুশি দেখছি। আমাদের দুঃখের সংসারে তোর এমনি মুখই আমরা সব সময় দেখতে চাই বাবা। কিন্তু সব জিনিসেরই একটা মাত্রা আছে। মাত্রা ছাড়িয়ে কোন কাজ করিস না যেন! শতদ্রু মায়ের কাছে সব কথা বলে। কোন কথা গোপন করে না। মা হাসেন। বলেন, পাগলা ছেলে। সত্য জিনিসটার দাম আছে পৃথিবীতে। এটা মেনে নিয়ে হাঁটবি। কোন অসুবিধা হবে না কোন দিন।

জ্ঞানদাময়ী হাসি মুখে বলেন, পাড়ার সবাই তোর সুনাম সুখ্যাতি করছে রাস্তাঘাটে। মেয়েরা কথায় কথায় তোর নাম করছে। কিন্তু খুব সামলে ভাই। আমরা মেয়েরা ফাঁদ-পাতা-জাত।

কথা শুনে মুখে কাপড় ঢাকা দিয়ে সরে যায় সর্বাণী।

সুস্মিতা ফাঁদ পেতেছে? না তার গুণে মুগ্ধ শতদ্রু? ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য লজ্জিত সুস্মিতা। আজ ক'জন এভাবে নিজের দোষ স্বীকার করতে পারে? তাছাড়া মনে পড়ে যায় অনুষ্ঠানের দিনের কথা। গানের পালা শেষ হয়ে যায়। শতদ্রু উঠে আসে। স্কীনের ধারে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। জীবনে এই অধ্যায়টির জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিল না সে। কিন্তু এক সূক্ষ্ম সূত্র ধীরে ধীরে এই ঘটনাগুলিকে একত্রিত করেছে। উজ্জ্বল তারা ভরা আকাশ। আজ কি ভালই না লাগছে তার। এমন সময় গলায় একটা মালা কে পরিয়ে দেয়। পিছন ফিরে তাকায় শতদ্রু। সুস্মিতা হাসে। বলে,

গ্রন্থনা অতুলনীয়। তাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

নীলিমাদি এগিয়ে আসেন। বলেন, গানের দরজা খুলে দিয়েছে তোমার গ্রন্থনা। খুব সুন্দর অনুষ্ঠান হয়েছে। মেয়েরা খুব খুশি। সমীর বাবু বলেন, ছেলেরা খুশি নয়?

শতদ্রু হাতের মালাটা টপ্ করে পরিয়ে দেয় সমীরবাবুর গালায়। মেয়েদের মুখ-টিপে চাপা-হাসি বন্ধ হয়ে যায়। শতদ্রু বলে, আপনার এই অভিনব পরিকল্পনার জন্য ধন্যবাদ। পুরো পরিবেশটা ভাবগম্ভীর হয়ে ওঠে।

সুস্মিতা বিস্ময়ে তাকায় শতদ্রুর দিকে।

শতদ্রু তখন সমীরবাবুর বাহুবন্ধনে আর উষ্ণ অভিনন্দনে অভিভূত।

॥ ৫ ॥

ধীর পদক্ষেপে শতদ্রু এসে দাঁড়ায় কয়েক ক্রোশ বেড়-করা ইতস্ততঃ ছড়ান দালান নাট-মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ আর গাছগাছালি ঘেরা সুবিস্তৃত বাজপেয়ীদের 'রাজবাড়ির' দক্ষিণ প্রান্তের অক্ষত মহলের তিনতলার বারান্দায়। জ্যামিতির হিসাব কষে বাড়ির এই অংশটা এমন ভাবে তৈরি, যেখান থেকে পুরো বাড়ির হদিস পাওয়া যায়। পশ্চিমে প্রবাহিত সুপ্রশস্ত ভাগীরথীর উচ্ছল তরঙ্গপ্রবাহ। কোন্ আদিকাল থেকে কত উত্থান পতনের কাহিনী বলে যায়। বলে যায় ঐশ্বর্যগড়ের বিশাল এই প্রাসাদের অভ্যন্তরের ঝাড়-লণ্ঠনের জীবন্ত রশ্মি এককালে গবাক্ষপথে ঝাঁপিয়ে পড়তো ভাগীরথীর বুকে। লক্ষ লক্ষ ঊর্মিমালা শিখর প্রদেশে পরিয়ে দিত আলোর মুকুট।

ঐশ্বর্যগড় এলাকার মানুষের আরাধ্য দেবতা লক্ষ্মীজনার্দন। তাঁর মন্দিরের চূড়া আজো উন্নত। অক্ষত। আকাশছোঁয়া এই চূড়ার দিকে তাকালে বাজপেয়ীদের আধ্যাত্ম চিন্তার একটা দিক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। লক্ষ্মীজনার্দনজীর মন্দিরের পাশে রামমন্দির। রাম লক্ষ্মণ হনুমানজী সেখানে আজো জীবন্ত বিগ্রহ। তারা বুঝেছিলেন অন্তরের দেবতাকে পছন্দমত একটা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করলেই হয়। এর জন্যে কোন বিশেষভাবে চিহ্নিত স্থানের প্রয়োজন নেই।

মন্দিরের পাশে একখানা ভাঙা বাড়িতে থাকে শতদ্রুরা। বাজপেয়ীরা

শতদ্রুর ঠাকুর্দাকে এখানে পুরোহিত হিসাবে আনেন। এখন রাজেশ্বর তর্করত্ন এই মন্দিরের পুরোহিত। মন্দিরে লক্ষ্মীজনার্দন ছাড়া শ্রীধর দধিবাহন ইত্যাদি শীলামূর্তি আছেন। বাবার অসুবিধা থাকলে শতদ্রুকেও বিশেষ পট্টবস্ত্র পরিধান করে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। প্রায় ত্রিশটি শিলা বিগ্রহ দশটি সুউচ্চ সিংহাসনে সাজান। ভেতরে কথা বললে বা মন্ত্র পাঠ করলে গম্ গম্ আওয়াজ ওঠে। আশপাশের পাড়ার লোকজন বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিনে ও তিথিতে সামনের বাঁধন-চত্বরে এসে দাঁড়ায়। প্রসাদ নেয়।

সবচেয়ে বড় উৎসব বৎসরের প্রথম দিন। পয়লা বৈশাখ। সেদিন সমস্ত মূর্তিকে গাওয়া-ঘি মাখিয়ে স্নান করান হয়। শুভ্রপুষ্পমাল্য দেবদেবীর মূর্তির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আশপাশের দশ বিশটা গ্রাম থেকে লোকজন আসে। বিরাট মাঠে ঘোড়দৌড় হয়। মেলা বসে। এর জন্যে সারা এলাকার মানুষ সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে।

বাজপেয়ীদের অনেক জমি জমা ছিল। ছোটখাট জমিদারের মত। আশ-পাশের লোকেরা বলতো রাজা। বাইরের ঠাটবাট বজায় রাখতে এদের আয়ের সিংহভাগ চলে যেতো। বিশেষ করে দেবসেবায়। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ মারা যাবার পর ছেলেপুলেরা কলকাতার বাড়িতেই থাকতে আরম্ভ করে। ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দেয়। কজন ছেলে উত্তরপ্রদেশে চিনির কল খুলেছে। আরো কয়েকজন অন্যান্য ব্যবসায় নেমে পড়েছে।

ঐশ্বর্যগড় পড়ে থাকে পোড়ো বাড়ি আর জগদানন্দের স্মৃতি বুকে নিয়ে বাজপেয়ী বাড়ির ছেলেরা বলে, ভাগ্য ফেরাতে তাদের পূর্বপুরুষ কনৌজ থেকে বাঙলায় এসেছিলেন। জমিজমা যোগাড় করে ছোটখাট জমিদারীর পত্তন করেছিলেন। তাতে ভাল আমদানী ছিল। তেজারতির কারবারও ছিল। এই ভাবে চলেছে বেশ কিছু দিন। রাজ্যরাজনীতির উত্থানপতনের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তনের ঘটেছে। সেদিনের সাজান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছে। আজকাল ভাল আমদানী করতে হলে, যেখানে যা করা দরকার— তাতো করতে হবে। কালের সঙ্গে খাপ খাইয়ে না চললে বাঁচা যায় নাকি?

একটা ব্যাপারে বাজপেয়ীরা রীতিমত সজাগ সতর্ক। পুজোর ব্যাপারটা সমানে চালিয়ে যাচ্ছে। পয়লা বৈশাখে বাড়ির সবাই চলে আসে পুরাতন বাড়িতে। লক্ষ্মীজনার্দনজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে। ওঁর আশীর্বাদে তাদের যা কিছু সবই হয়েছে। এ বিশ্বাস সবার মধ্যেই সমান ভাবে

গেঁথে আছে।

রাজেশ্বর তর্করত্ন দুবেলা দুমুঠো ভাত যোগাড় করতে পারেন বাজপেয়ীদের কল্যাণে। তার বাবাও তাই করতেন। শতদ্রু নিজের কথা এখনো ভাবে না। কিছু না মিললে ওটা তো আছেই। জ্ঞানদাময়ী সর্বাণী সেকথা বললেও সামনের দিনের সূর্যের আলো তাদের চোখে মুখে এসে পড়েছে। তাই তাদের সন্তান শুধু দুধে ভাতে থাকবে এই আশাই করে না। আগামী দিনে মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠুক তাদের সন্তান—এই কামনাও করেন। দুই পুরুষের দুই মাতৃ-মূর্তি মনে-প্রাণে কামনা করেন, তাদের সন্তান যেন যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারে। তাতে যত ঝড়-ঝাপটা আসে আসুক ?

একটা জিনিস সমগ্র জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন জ্ঞানদাময়ী, দুঃখী মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে পারে খুব কম মানুষ। বিপ্লবী যুগের জোয়ানেরা এই কথাই উচ্চ-কণ্ঠে ঘোষণা করে গেলেন, অশিক্ষার-বুভুক্ষার-শিকার দেশের শোষিত মানুষের জন্য জীবনপণ লড়াই করে এগিয়ে না গেলে মুক্তি নেই। কথাটা খুব সহজ-সরল। কিন্তু এদিকে মানুষকে সহজে আনা যায় না। জ্ঞানদাময়ী নিজের সন্তানকে স্ফুলিঙ্গের মত উড়ে যেতে দেখেছেন। আজ বয়সের ভারেও তার চোখের দৃষ্টি এতটুকু ঝাপসা নয়।

সেদিন বিকালে একদল লোক পঞ্চু কচিরামের নেতৃত্বে শতদ্রুদের বাড়ির সামনে এসে বসে পড়ে। রাজেশ্বর হাটে যাবার জন্যে বেরিয়ে ছিলেন। সবাইকে এই অবস্থায় দেখে বলেন, কি বাবা—দল বেঁধে কি উদ্দেশ্যে ?

বিপদে পড়ে এসিচি গুরুদেব—আপনাকে রক্ষে কত্তে হবে।

আমি রক্ষা করবো ?

হ্যাঁ। আপনিই আমাদের রক্ষে করতে পারেন। সারা এলাকার হিত করাই তো আপনার কাজ। মন্দিরের সামনে হাতে প্রসাদ তুলে দিয়ে এ কথাই তো আপনি আমাদের বলেন। বলে কচিরাম।

বিস্মিত রাজেশ্বর ধীরে ধীরে বলেন, ব্যাপার কি খুলে বল বাবা।

আজ আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন। সাহায্য করুন। যাতে আমরা বাঁচতে পারি। বলে কচিরাম।

কি বলতে চাচ্ছো খুলে বল বাবা। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

পঞ্চু পাকা মাথায় আঙুল বোলাতে বোলাতে বলে, কথা দিন দেবতা মরণের হাত থেকে আমাদের রক্ষে করবেন।

ধরা গলায় বলেন রাজেশ্বর, বল তোমাদের জন্যে কি করতে হবে ?

পঞ্চু বলে, আপনার সুপুত্র শতদ্রু বাবাজীবনকে আমাদের সঙ্গে কিছু দিনের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে। উনি কাগজপত্র দেখে দেবেন। হাকিম কানুনগোর সঙ্গে কথা বলবেন—যাতে আমরা এ যাত্রা উদ্ধার হই।

কিসের কাগজ দেখবে শতদ্রু ? কোন্ কানুনগোর সঙ্গে কথা বলবে ?

আমরা যে জমিতে চাষ করি অগ্রিম টাকা দিয়ে। সেখান থেকে উচ্ছেদ করতে চায় মালিক। কাঁদ কাঁদ হয়ে কথা বলে কচিরাম।

উচ্ছেদ ? রাজেশ্বরের মাথাটা ঘুরে যায়। সামনে একটা ছবি ফুটে ওঠে। তার বাবাকে জমিদারের পাইক বরকন্দাজ উচ্ছেদ করেছিল। মহাজন আর গাঁয়ের প্রভাবশালী লোকেরা একত্রিত হয়েছিল। কারণ একটাই। তারা সত্যি কথাটা জোরের সঙ্গে বলেছিল সেদিন। গাঁয়ের মোড়ল একজন নিরীহ কৃষককে প্রকাশ্য দিবালোকে গলা টিপে খুন করেছিল। পঞ্চানন বেদান্ততীর্থ সেটা নিজের চোখে দেখেছিলেন। স্পষ্ট প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন আর বলেছিলেন রাজদরবারে সত্য কথাটা বলবেন। মোড়ল মশাই তাঁর মুখবন্ধ করার জন্য হাজার চেষ্টা করেও কিছু করে উঠতে পারেন নি। মিথ্যা সাক্ষী দিতে অনুরোধ করে তীব্র ভৎসনার সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল মোড়লকে। শেষ পর্যন্ত রাগে দুঃখে জ্বালায় জমিদার দীনবন্ধু রায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাকি খাজনার দায়ে উচ্ছেদের মামলা এনে উৎখাত করেছিলেন পঞ্চানন বেদান্ততীর্থকে। সেদিন ক্ষতবিক্ষত শরীরে হাসি মুখে চলে এসেছিলেন বেদান্ততীর্থ মশায়। বলেছিলেন, সঙ্গে কিছু নিয়ে যেতে না পারলেও সত্যভ্রষ্ট তো হইনি।

সেই সময় দীনবন্ধু রায়ের প্রতিপক্ষ বাজপেয়ীরা পঞ্চানন বেদান্ততীর্থকে বাসস্থান দিয়ে লক্ষ্মীজনার্দনের সেবাইত নির্বাচন করেন। নদীর এককূল ভাঙলেও—

না না। উচ্ছেদ করা যাবে না। রাজেশ্বর চিৎকার করে ওঠেন।

ছেলের চিৎকার, অসংখ্য লোকের কোলাহলে বাইরে বেরিয়ে আসেন জ্ঞানদাময়ী। সমস্ত শুনে কালনাগিনীর মত ফণা তুলে বলেন, একা একা থাকলে শেষ করে দেবে শয়তানরা। দল বেঁধে প্রতিবাদ কর। ফুঁসে ওঠ

সবাই। জমি থেকে উৎখাত করতে পারবে না।

মা জননী গো আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। চোখ থাকতে কানা। না জানি কাগজপত্র পড়তে। না জানি আইনমত কথাবার্তা বলতে। আমাদের হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে সে কাজটা কে করবে মা? পঞ্চু মোড়ল গলায় আঁচল দিয়ে জ্ঞানদাময়ীর পায়ের ধুলো নিয়ে একথা বলে।

একটু চিন্তা করেন জ্ঞানদাময়ী। অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আকাশপাতাল চিন্তা করতে থাকেন রাজেশ্বর।

কি বলবে আগে থেকেই কচিরাম ঠিক করে এসেছিল। পঞ্চুর দিকে এগিয়ে গিয়ে জ্ঞানদাময়ীর কাছাকাছি হয়ে বলে, শতদ্রু দা-ঠাকুরকে এই কাজে সাহায্য করার জন্যে আদেশ দিন মা।

এমন একটা প্রস্তাব উপস্থিত হতে পারে তা কেউ কোনদিন চিন্তা করতে পারে না। কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ থাকে। প্রথমেই এই নীরবতা ভঙ্গ করেন জ্ঞানদাময়ী। ধীর কণ্ঠে বলেন, আমাদের শত এ কাজ পারবে?

হাঁ পারবে মা।

ওকে দিয়ে যদি তোমারের এই মূল্যবান কাজ উদ্ধার হয় তা হোক। জ্ঞানদাময়ী লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দিরের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করেন। সবাই হাত জোড় করে। রাজেশ্বর মাটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। হঠাৎ জ্ঞানদাময়ীর উচ্চ কণ্ঠ শুনে সবাই চমকে ওঠেন। তিনি বলেন, লক্ষ্মীজনার্দন পাথরের ঠাকুর নয়। লক্ষ্মীজনার্দন জীবন্ত বিগ্রহ। শুধু হাত জোড় করে ওঁর কাছে দাঁড়ালে হবে না। প্রয়োজনে বাঁশি ছেড়ে সুদর্শন চক্রও ধরতে হয়েছিল ওঁকে। তোদেরও ধরতে হবে। পারবি তো?

চিৎকার করে ওঠে সবাই। 'আশীর্বাদ করুন মা। আমরা পারবো।'

শতদ্রু নত-মস্তকে বাবার সামনে এসে দাঁড়ায়। রাজেশ্বর বলেন, দেখো ওরা কি বলে। রাজেশ্বর আড়চোখে তাকিয়ে দেখে, শতদ্রুর মুখখানায় অজয়ের ছাপ।

শতদ্রুর জীবনে এক নতুন অধ্যায় নেমে আসে। এমন কত অধ্যায় আসবে তার সীমা নেই। একটা কথা সে শিখেছে, আন্তরিকতা না থাকলে কোন কাজই সম্পূর্ণ হবে না। জীবনের সব কটি কাজে সুন্দর সার্থক হতে হবে। এখন সাঁতার না জেনে জলরাশির সামনে এসে দাঁড়াবার মত অবস্থা হয়েছে

তার। জমি-জায়গা ব্যাপারে তার কোন কিছু জানা নেই। কি করতে হবে তাও জানা নেই। ওদের সামনে এসে দাঁড়াবার মত শিক্ষাই তো নেই তার। কিন্তু জ্ঞানদাময়ী একটা কথা বলেন, কোন অবস্থাতেই ভয় করিস না শত। এগিয়ে যা। মনটা ঠিক করে রাখ। কাজে যদি নিষ্ঠা থাকে, কখন কি করতে হবে তার স্পষ্ট নির্দেশ তুই সময়মত পেয়ে যাবি।

শতদ্রু একপাল মানুষকে নিয়ে বসে। তাদের কথা শুনে শুনে একটা নতুন জগৎ খুঁজে পায়। নিজেদের বঞ্চিত জীবনের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা এ জীবন। তাই অনুভব করতে বেগ পেতে হয় না। ওদের ভাসা-ভাসা কথা থেকে অনেক কিছুই শিখে ফেলে সে। কাঁচিরাম পণ্ডু তো অনেক কিছুই জানে। গামছা পরা মানুষগুলো অভিজ্ঞতা আর শিক্ষায় কোন অংশে কম যায় না! বইয়ের পৃষ্ঠার মধ্যেই শিক্ষাটা সীমাবদ্ধ এই কথা ভাবাটা রীতিমত ভুল। শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া মানুষ ঘাত-প্রতিঘাতের অধ্যায় শেষ করে বিরাট এক অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়। ইতিহাসের কয়েকজন দিকপাল শুধু এ ব্যাপারে দিক-দর্শনকারী নয়। গ্রামেগঞ্জে হাজার হাজার এই 'মানের' মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আগামীদিনের ইতিহাস তৈরি করবে তারা।

বড় একখানা খাতায় শতদ্রু নাম লিখতে শুরু করে। কাঁচিরাম বলে, দাদুন 'চস্তি' এক জায়গায় লিখ 'বস্তি' অন্য জায়গায় লিখ। 'চস্তি-বস্তি' শব্দ দুটো শতদ্রুর মাথায় গোলমাল সৃষ্টি করে। কাঁচিরামের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে শতদ্রু। কাঁচিরাম বলে, যারা চাষ করে তারা হলো গে চস্তি আর ঘরবাড়ি তৈরি করে জমি দখল করেছে যারা তারা হলো বস্তি। হো হো করে হেসে উঠে শতদ্রু। বলে, এমন কথা। তোমার পাঠশালায় পড়ে এখনো অনেক শিখতে হবে আমাকে।

তবে! মাথা নেড়ে নেড়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে কাঁচিরাম।

কাঁচিরাম গুলে নিতাই হারান শতদ্রুকে মৌজা ম্যাপ দেখে নির্দিষ্ট চাষীর জমির চটপট দাগ নম্বর কি করে ধরে ফেলা যায় শিখিয়ে দেয়। ব্যাপারটা এমন কিছু নয়! তবু ওদের আগ্রহ মুগ্ধ করে শতদ্রুকে। ম্যাপ হাতে জমিতে গিয়ে দাঁড়ায় শতদ্রু। চাষীদের জমির দাগ নম্বর ঠিক করে নেয়। ওরা চাষ করে কিন্তু দাগ নম্বর জানে না। ভবানীবাবু টাকার কোন রসিদ দেন না। রসিদ কেন দেন না আজ চটপট বলে ফেলে কাঁচিরাম। বলে, 'ডগ্‌মেণ্ট' হয়ে যাবে তাহলে। এই ধরনের 'মেঠো-মাথার' মানুষগুলোকে জ্ঞানগম্যিহীন বলে

যারা মনে করে তারা এদের অনেক গুণেরই পরিচয় পায় না। পথে নেমে আজ অনেক অজানাকেই জানতে পারে শতদ্রু। শুধু পথের ধারে দাঁড়িয়ে এসব জিনিসের হদিস পাওয়া যায় না। পথ চলার ছন্দে 'চড়াই উৎরাইয়ে' এই সমস্ত অমূল্য রত্নের সন্ধান পাওয়া যায়।

শতদ্রুকে কিছু কিছু বই যোগাড় করতে হচ্ছে আজকাল। যোগাড় করতে হচ্ছে অনেক তথ্য। এর জন্য পরিশ্রম কম হচ্ছে না। নাড়ির টানে আটকে যাওয়া অবস্থায় আজকাল সুস্মিতাদের বাড়িকে পাশ কাটিয়ে চলে আসতে হচ্ছে। কৃষকদের সঙ্গে ঘন ঘন বসা খুবই দরকার। এখানে ঢুকে পড়লে অন্য দিকে সময় দেওয়া যাবে না। আজকাল আরো একটা সত্য উপলব্ধি করেছে শতদ্রু। কোন কাজ করার জন্যে সময় পাওয়া যায় না, কথাটা ঠিক নয়। সময় করে নিতে হয়। কাজের আগেই ভেবে নিতে হয় কোন কাজটা করবে। কোনটা আপাতত বাদ দেওয়া যায়। এই অঙ্কে ভুল হলে জীবনের মূল লক্ষ্যে পৌঁছান যাবে না। অঙ্ক করে হিসাব কষে পথ চলতে হবে প্রতিদিন। জীবন-কেন্দ্রিক অনেক প্রশ্নই আজ তার সামনে কিলবিল করছে।

মাঝে একদিন নদীর ধারে পাকড়াও হয়ে যায় শতদ্রু। কলেজ থেকে ফেরার পথে দূর থেকে দেখতে পায় মেরুন-রঙের একখানা শাড়ি পরে দুষ্টুমি মাখা মুখে দাঁড়িয়ে আছে সুস্মিতা। কাছাকাছি হতেই বলে ওঠে, মহারাজ বহুদিন পরে আমার হাতে আজ ধরা পড়ে গেলেন।

হাসিমুখে বলে শতদ্রু, পড়লুম।

বাবা কি একটা কথা বলবেন। আমায় দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। সময় হবে তো?

নিশ্চয় হবে। বলে, তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে শতদ্রু। আজ রাত আটটা নাগাদ একটা বৈঠক আছে। তার আগে কোন অসুবিধা নেই। হৃষ্ট চিত্তে হাঁটে শতদ্রু। বসার ঘরের কাছাকাছি হতে সৌমেনবাবু ডাকেন, এসো এসো শতদ্রু। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

রাশভারি ভদ্রলোক সৌমেনবাবু। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কিছু কিছু কাজ করেছেন। পার্টি কংগ্রেসে প্রতিটি নেতার বক্তব্য প্রায় তার কণ্ঠস্থ। নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর কষ্টিপাথরে তাদের বক্তব্যের সমালোচনা করতে খুবই ভালবাসেন। এ ব্যাপারে পড়াশোনা না থাকলে খুব অসুবিধা। কয়েকবার বেকায়দায় পড়ার পর শতদ্রু কয়েকখানা বই যোগাড় করেছে। তারপর জগৎ

সংসারে যা হয় তাই হয়েছে। আজকাল শতদ্রুর ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সব কিছুর বিশ্লেষণ দেখে মাঝে মাঝে থমকে যান সৌমেনবাবু। সেই গ্রাম্য ছেলেটা! এখন কোন জড়তা নেই তার মধ্যে। তেজদীপ্ত কণ্ঠে তার আপন বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করার ভঙ্গী দেখে সবাই বিস্মিত হয়।

আজ সৌমেনবাবু বলেন, আগে তুমি মুখে-হাতে একটু জল দিয়ে নাও। তারপর কথা হবে।

খাবার টেবিলে সুস্মিতাকে জিজ্ঞাসা করে শতদ্রু, কি কথা বলবেন সৌমেনবাবু?

সুস্মিতা বলে, ঈশ্বর জানেন।

হাঁ। যিনি সব কিছু জানেন। এমন কি তোমার আমার মনের কথা পর্যন্ত। এমন একজনকে সৃষ্টি করে রেখেছি তো আমরা। শতদ্রুর কথা শুনে হাসে সুস্মিতা। হাসলে ওকে ভারি সুন্দর দেখায়।

শতদ্রু সুস্মিতার হাসির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, আমার বলার কিছু নেই। আমি মনের-কথা সব সময় বলে দিই। অবশ্য তোমার মধ্যে কোন কথা গোপন থাকলে 'তিনি' তা জানতে পারেন। সে ব্যাপারে আমার কাছে তিনি সুপারিশও করতে পারেন। দুষ্টুমিভরা চোখে শতদ্রুর দিকে তাকায় সুস্মিতা। বলে, দুপক্ষের জন্যে দুপক্ষকেই সুপারিশ করতে পারেন তিনি।

সৌমেনবাবু আসেন। শতদ্রুর সামনে বসে পড়েন। আজ যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে শতদ্রু। কয়েক আলমারী বই। ছোট্ট একটা টেবিলে বুদ্ধদেবের মূর্তি। ক্রুশবিদ্ধ যিশুখ্রীষ্টের সুন্দর একখানা ছবি। সবকিছু মিলে এক সুন্দর পরিবেশ। পশ্চিমের জানালার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি চলে যায় ভাগীরথীর স্রোতে। দোলা-খাওয়া অজস্র নৌকো চোখে পড়ে। চোখে পড়ে নদীর পশ্চিম পাড়ে ঘন সবুজ গাছ-গাছালি। নীল আকাশ। মাঝে মাঝে বকের পাল ভেসে যায়। ভেসে যায় পানকৌড়ির দল।

সৌমেনবাবু বলেন, শতদ্রু তুমি নাকি আজকাল লাল-ঝাণ্ডাদের সঙ্গে মেলামেশা করছো?

আজ্ঞে হাঁ।

তোমার কাকা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। কথা শেষে চুপ করে থাকেন সৌমেনবাবু। গম্ভীরভাবে।

ন্যায়নীতি যদি মাপকাঠি হয় তাহলে একদিন আপনিও আপনার জায়গায় থাকতে পারবেন না। ধীরে ধীরে কথাগুলি বলে শতদ্রু।

কেন?

আপনি তো অবিনাশ ঘোষালকে চেনেন। উনি স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন-পণ লড়াই করেছেন। তার একটা হাত বেয়নেটের আঘাতে প্রায় পঙ্গু হয়ে গেছে। সেই অবিনাশবাবু আজ এক বিদেশী কোম্পানীর পক্ষে। দেশের গরীব চাষীদের বিপক্ষে। কথার সঙ্গে দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া দেখা যায় শতদ্রুর মধ্যে।

অবিনাশবাবু যা করছেন তা কি অন্যায়? সৌমেনবাবু বলেন।

আমি মনে করি রীতিমত অন্যায়।

কেন?

আপনারা স্বাধীনতার জন্যে জেল খেটেছেন। দেশের জন্যে স্বার্থ ত্যাগ করেছেন। আজ মুক্ত দেশের মানুষের ওপর কেউ জোঁকের মত শোষণ চালিয়ে যাবে, এটা আপনি সমর্থন করবেন?

তুমি যেটাকে শোষণ বলে মনে করছো সেটা কি সত্যিই তাই?

হাঁ শোষণ। এনড্রুল কোম্পানী দু'হাজার বিঘে জমি কিনেছিল। কারখানা তৈরি করার জন্যে। কারখানা এখানে তৈরি হলো না। তাই জমিটা চাষের জমি হিসাবেই পড়ে রইল। কোম্পানীর এটর্নী সাহেব, যার নামে জমি কেনা হয়েছিল—তিনি জমি দেখাশোনার ভার দিলেন ভবানীবাবুর ওপর। ভবানীবাবু দু'হাজার বিঘে জমি বিলি করছেন অগ্রিম-টাকা নিয়ে। এখানকার চাষীদের ভাষায় 'আগাম-টাকায়'। টাকাটা যদি খাজনা হয়, তাহলে বলবো অস্বাভাবিক হারে খাজনা নিচ্ছেন ভবানীবাবু। আর অন্যভাবে যদি দেখেন তাহলে বলতে হয় জমির উৎপাদনের একটা অংশ টাকার মাধ্যমে চাষীরা মালিককে দিচ্ছে ভাগচাষীদের মত। তাহলে তাদের উচ্ছেদ করা যাবে কি করে? আইন তো আজ পরিবর্তন হয়েছে। অথচ অবিনাশবাবু এদের উচ্ছেদ করার জন্যে রীতিমত উঠে-পড়ে লেগেছেন।

সৌমেনবাবু কোন কথা বলেন না। চুপচাপ শুনে যান।

শতদ্রু বলে যায়, এই সমস্ত জমি এককালে এখানকার চাষীদের বাপ-ঠাকুর্দার চাষের জমি ছিল। লোভ দেখিয়ে চাপ দিয়ে জমি কিনেছিল কোম্পানী। আজ দরিদ্র কৃষকেরা যাবে কোথা? আইনমত এদের ব্যবস্থা করতে

হবে না ? শোষণের হাত থেকে বাঁচাতে হবে না ?

সৌমেনবাবু চিন্তা করেন। আগেকার দিনের কথা ভাবেন। জঙ্গলে লুকিয়ে বিপিন গাঙ্গুলী, চারু ভাণ্ডারী, প্রভাস রায়, অজয় ঘোষাল, সুধীর বিন্দুরা এই একই ধরনের কথাই তো চিন্তা করতেন। দেশকে স্বাধীন করতে হবে। দেশের মানুষগুলো অশিক্ষার অন্ধকারে পড়ে আছে, তাদের আলোয় আনতে হবে। বাঁচার পথ তৈরি করতে হবে। শোষণমুক্ত করতে হবে। শতদ্রুর মুখ দিয়ে তো সেই একই ধরণের কথা বেরিয়ে আসছে। কৃষকদের জমির অধিকার তো দিতেই হবে।

সুস্মিতা সামনে এসে দাঁড়ায়। সৌমেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে, তোমায় একটু চা দেবো বাবা ?

হাঁ। আমায় চা দাও। শতদ্রুকে অন্য কিছু দাও।

চায়ে চুমুক দিয়ে সৌমেনবাবু বলেন, মোঘলযুগ থেকে যারা খাজনা আদায় করতো তারা জমির মালিক হয়ে গেল। চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় কর্ণওয়ালিশ সাহেব বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় সেই ব্যবস্থাটা পাকা করে দিলেন।

শতদ্রু সৌমেনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে আশার আলো দেখতে পায়। ধীরে ধীরে বলে যান সৌমেনবাবু, সুবে বাংলা থেকে অনেক-অনেক গুণ খাজনা আদায় হতে লাগল। কৃষকেরা সর্বশ্রান্ত হয়ে গেল। থালা-ঘটি-বাটি গরু-লাঙল বিক্রি হয়ে যেতে লাগল। কৃষক ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালাতে লাগল। তবু এই শ্মশানের ওপর থেকে আয় বাড়াতেই হবে। নিষ্ঠুর-নির্দয়-পাপিষ্ঠ শয়তানেরা অবাধে চালিয়ে যেতে লাগল অমানুষিক শোষণ।

সুস্মিতা গালে হাত দিয়ে বসে। বিজ্ঞের মত সবকিছু শুনে যায়। বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে সৌমেনবাবু আর শতদ্রুর দিকে। আজ শতদ্রুকে যেন অনেক দূরের অপরিচিত একজন বলে মনে হয়। তার বাবাকেও। সুস্মিতার মা এসে দাঁড়িয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। সৌম্য মাতৃমূর্তি।

সৌমেনবাবু বলেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জমিদারদের খাজনা বাড়াবার যে অবাধ সুযোগ করে দিলেন সেটা ঠিক হয়নি।

শতদ্রু শ্লেষের ভঙ্গীতে ধীর কণ্ঠে বলে, রাজকোষের আয় বাড়াতে হবে। তখনকার দিনে এছাড়া আর উপায় কি ছিল বলুন ? শোষক তার নিজস্ব চরিত্রে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেই। আজ যেমন ভবানীবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে সাহায্য করছেন অবিনাশবাবু।

সৌমেনবাবুর কণ্ঠে অস্বাভাবিক মাত্রায় গাম্ভীর্য ফুটে ওঠে। তিনি বলেন, এই জুলুম অত্যাচারকে স্বীকার করে মাথা পেতে নেয় না কৃষকেরা। তাই বিদ্রোহ হয়েছে। তীব্র প্রতিবাদ জানান হয়েছে। লড়াই হয়েছে। আজও হবে।

শতদ্রু ধীর গলায় বলে, এর ফলেই তো 'রোট' এ্যাক্ট তৈরি হয়ে জমিদারদের ইচ্ছামত খাজনা বাড়াবার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল।

ঠিক তাই। সৌমেনবাবু এবার গলার স্বরটা রীতিমত নীচু করে এনে বলেন, সিপাহী বিদ্রোহে খুব ধাক্কা খায় বৃটিশ-পুঁজির মালিক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে দেশের শাসনভার আর রাখা উচিত নয় স্থির করে ফেলে। কথা বলতে বলতে সৌমেনবাবু বলেন, মিতা পশ্চিমের পর্দাগুলো টেনে দাও তো মা। এখন তো আর রোদ্দুর নেই।

ভাগীরথীর জলস্রোত আরো বিস্তৃত আকারে চোখে পড়ে। রাস্তার বাতির নরম-আলোয় নদীর এক নতুন রূপ দেখতে পায় শতদ্রু। বয়ার ওপর নীল-লাল আলোর সংকেত। আলো-ঝলমলে একটা বিশাল জাহাজ গমগম আওয়াজ করতে করতে সমুদ্রের দিকে চলে যায়। একটার পর একটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে নদীর চরে।

সৌমেনবাবু বলেন, প্রজাস্বত্ত্ব আইনটা সম্পর্কে জান তো শতদ্রু?

হাঁ। ১৮৭০ সালে উত্তর বাংলার চাষীরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তার ধাক্কায় সরকার ১৮৮৫ সালে প্রজাস্বত্ত্ব আইন পাশ করেন। কিন্তু এটা তো লোক-দেখান স্তোক বাক্য। বলা হলো প্রজাদের স্বত্ত্ব কিছুটা সংরক্ষিত হবে। কিন্তু বাস্তবে তার কোন আঁচ পাওয়া গেল না।

এটা বোঝ না কেন শতদ্রু, আইন তৈরি হচ্ছে আর সেটা ভেঙে চুরমার করে ফেলার জন্যে একদল লোক উঠে পড়ে লাগছে। মানুষের রক্তচোষা-নীতিকে মজবুত করছে।...গরীব মানুষ কিন্তু বসে নেই। তারা আন্দোলনের পর আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তাই ১৯২৮ সালে কিছু আর ১৯৩৮ সালে কিছু প্রজাস্বত্ত্ব আইনের সংশোধন হয়। কিন্তু এতেও কি শোষণের জাঁতাকলের কাজ বন্ধ থাকে? রক্তচোষা যাদের স্বভাব, তাদের নিরস্ত করা খুব মুশকিল। শেষের দিকে ধীরে ধীরে কথাগুলি বলে যান সৌমেনবাবু।

ওপরে নীল আকাশ। নীচে অমৃতের সন্তান মানুষ। এই মানুষ পৃথিবী-মায়ের সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী। সবাই ভোগ করবে সমস্ত সম্পদ। কিন্তু তা হয় না। একদল শয়তান সারা পৃথিবী দাপিয়ে বেড়ায়। মানুষের সমস্ত

সম্পদ কয়েকজনে লুটেপুটে খায়। দেশে দেশে তাদের অনেক দোসর আছে। তারা বলে, লক্ষ কোটি মানুষের যন্ত্রণা নেহাৎ তাদের কপালের-দোষ। তারা উঁচু-পিঁড়িতে বসিয়ে রেখেছে কিছু মানুষকে। অবাধে নিজেদের অন্যায় ঢাকার চেষ্টা করছে। উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে থাকে শতদ্রু। সুস্মিতা খাবারের থালা রেখে উভয়ের মুখের দিকে তাকায়। কোন কথা বলে না। তার সামনে থেকে সৌমেনবাবু আর শতদ্রু যেন হারিয়ে যাচ্ছে। ওদের চেনা যাচ্ছে না। অনেক দূরে চলে যাচ্ছে ওরা।

সৌমেনবাবু খাবারের টুকরো চিবোতে চিবোতে বলেন, অবিনাশবাবু কি সরাসরি ভবানীবাবুর পক্ষ নিয়েছেন?

হাঁ। ওঁকে নাকি বিঘে-পঁচিশ জমি দেবার ব্যবস্থা করবেন ভবানীবাবু।

তাই নাকি?

হাঁ।

আত্মসমীক্ষায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকেন সৌমেনবাবু। বনে জঙ্গলে বসে একদিন দুর্গত মানুষের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে উত্তেজনায় ছটফট করতেন তারা। আজ ভারত স্বাধীন। স্বাধীনতার পর বেশ কয়েক বছর চলে গেল। এখনো চলেছে সমানে শোষণের রাজত্ব। আজ শতদ্রুরা সৌমেনবাবুদের জীবনাদর্শের সল্‌তে ধিক্‌ধিক্‌ করে জ্বালিয়ে রেখেছে মাত্র। একদিন যারা শপথ নিয়েছিলেন মুক্ত করবে ভারতকে। ইংরেজ চলে যাবার পর আজ স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সারির কর্মী বলে যারা নিজেদের পরিচয় দেন—তারা নিজের কাজে ব্যস্ত। আমিও তার থেকে বাদ যাই না। দেশের মানুষের সঙ্কট-মোচনের যে দায়িত্ব নেওয়া হয়েছিল—তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার লোকের খুব অভাব। তাই যা হবার তা হচ্ছে দেশ জুড়ে।

'এই যে এখানে সব বসে—' বলে হাসতে হাসতে ঘরের মধ্যে ঢোকেন অবিনাশবাবু। শতদ্রুর মুখের দিকে কঠোরভাবে দৃষ্টি ফেলে সুস্মিতার দিকে তাকান বিশেষ কায়দায়। তাৎপর্যপূর্ণ ভঙ্গীতে।

শান্ত কণ্ঠে সৌমেনবাবু বলেন, এতক্ষণ ফেলে-আসা জীবনের রস আস্বাদন করছিলাম শতদ্রুকে পেয়ে।

তাই নাকি? অবিনাশবাবুর কথার স্বরে রীতিমত বিদ্রূপ মেশান।

হাঁ। শতদ্রু কিছু কিছু খবর রাখে তো। তাছাড়া পড়াশোনাও করে।

কিসের খবর রাখে?

দেশের মানুষের। যাদের নিয়ে দেশ।

দেশের চোর ডাকাতদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে তো রীতিমত কুরুক্ষেত্র তৈরি করেছে বাছাধন। পয়সা দিয়ে কেনা জমির মালিক ওঁর কথায় কেউ নয়। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে যারা তারা নাকি 'পেরজা'!

শতদ্রু সৌমেনবাবুর মুখের দিকে তাকায়। সৌমেনবাবু মাথা নীচু করে নেন। অবস্থাটা অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে যায় শতদ্রুর কাছে। সংগ্রামী জীবনের এককালের সাথীর সঙ্গে সামনা-সামনি লড়তে চাচ্ছেন না সৌমেনবাবু। অবস্থা দেখে শতদ্রু বলে, আজ চলি। অন্য দিন আসবো। অবিনাশবাবু বলে ওঠেন, না না, সামনে পেয়েছি দু'চারটে কথা বলে নিই। তুমি একটু বোস।

শতদ্রু বসে পড়ে।

অবিনাশবাবু বলেন, ওটা এণ্ড্রুল কোম্পানীর কেনা জমি, তা তুমি নিশ্চয় জান শতদ্রু?

জানি।

তাহলে একপাল লোক নিয়ে উৎপাত করছো কেন?

উৎপাত করছি না তো। দীর্ঘ দিন যারা টাকা দিয়ে জমি চাষ করে দখলীকার হিসাবে তাদের নাম লেখাতে চাচ্ছি মাত্র।

তারা যে দখলীকার তার প্রমাণ কি?

এলাকার লোক সাক্ষী দেবে। তারা অগ্রিম-টাকা দিয়ে জমি চাষ করে।

সাক্ষী দিলেই হলো। জমির প্রাণ হচ্ছে কাগজ। কাগজপত্র কোথা?

ভবানীবাবুরা কি এতো কাঁচা-লোক যে প্রতিবছর টাকা নিয়ে দাখিলা বা রসিদ দেবেন? একটুকরো কাগজও দেননি। পুরোটাই হয়েছে মৌখিক বন্দোবস্তের ভিত্তিতে।

তার মানে?

মানে পরিষ্কার। টাকা নিলেন। রসিদ দিলেন না। প্রমাণ রাখলেন না। যে কোনদিন জমি থেকে উচ্ছেদ করবেন—এই আর কি?

যেখানে স্বত্ব নেই সেখানে উচ্ছেদ হবে না কেন?

স্বত্ব নেই বলছেন কি করে?

ওদের স্বত্ব আদৌ নেই বলে। বললেন অবিনাশবাবু।

আমি বলি স্বত্ব আছে। টাকা দিয়ে জমি চাষ করে তারা। সাক্ষীরা তা প্রমাণ করবে। জমিদারী প্রথা চলে গেছে। মধ্যস্বত্বও আর নেই। তাই জমিতে

যে চাষীরা চাষ করে তারাই প্রজা। এ ধরনের আইন হয়েছে।

টাকা নেওয়ার কোন প্রমাণ দিতে পারবে না তো কেউ।

টাকা নেবার প্রমাণ না থাকলেও জমিতে দখলের প্রমাণটা তো দেবে। বারো বৎসরের ঊর্ধ্বকাল যদি দখলে থাকে তাহলে 'জবর দখল' লেখাবে। মালিকের অনুমতিতে বারো বৎসরের বেশি সময় কোন জমিতে থাকলেই তো স্বত্ত্ব এসে যায়?

মালিকের অনুমতি ছিল?

ছিল বৈকি। নাহলে হটিয়ে দেয়নি কেন? রিভিশনাল সেটেলমেন্ট শুরু হয়েছে। মাঠ জরিপে দখল লেখাবে। তার পর নাম রেকর্ড হবে এ্যাটেস্টেশন ক্যাম্পে। এই জন্যেই তো এই ধরনের সেটেলমেন্ট শুরু হয়েছে।

তার পরেও ধারা আছে তো।

চলবে। কোর্টে বা নির্দিষ্ট জায়গায় মামলা চলবে। এলাকার চাষীরা জমিটার দখল রাখবে। সংগঠিত কৃষকেরা আন্দোলন চালিয়ে যাবে। এককালে আপনারাই তো ভূমিহীন কৃষকদের হাতে জমি দেবার চিন্তা করেছেন। আজ সাহায্য করবেন আপনারাও।

এবার সৌমেনবাবু মুখ খোলেন। বলেন, বর্গাদারদেরও জমি থেকে সরান যাবে না। ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টে বলা আছে। যে প্রকৃত-চাষী তার সম্পত্তি লাখেরাজ হোক। তার খাজনা লাগবে না। তাকে জমির মালিক করতে হবে। তাই এক সময় আমরাই তো জোর গলায় বলেছি, 'লাঙল যার জমি তার'।

শতদ্রু সোৎসাহে তাকিয়ে থাকে সৌমেনবাবুর দিকে। একটু আগে পর্যন্ত তার ভাবনার মধ্যে বাসা বেঁধে ছিল—বন্ধু অবিনাশবাবুর বিরুদ্ধে কোন কথা হয়ত বলতে পারবেন না তিনি। কিন্তু তার অনুমান ঠিক নয়। আজ জ্ঞানদাময়ী সর্বাণীর মুখের পাশে আরও একটা মুখ এসে দাঁড়িয়ে যায়।

অবিনাশবাবু বিষণ্ণ মুখে বলেন, বুঝলুম—তোমরা সবাই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছ।

সৌমেনবাবু খুব জোরের সঙ্গে বলে ওঠেন, একটা আদর্শ আর নীতির ভিত্তিতে স্বদেশী আমলে আমরা কাজ করেছি অবিনাশবাবু। আদর্শ নীতি বিসর্জন দিয়ে নয়। আজকেই বা আদর্শ নীতি বাদ দিয়ে হাঁটবো ভাবেন কি করে?

অবিনাশবাবু উঠে পড়েন। বিশ্রী ভাষায় কটূক্তি করতে করতে চলে যান। সুস্মিতাকে জড়িয়ে বিশ্রী একটা ইঙ্গিত পর্যন্ত করতে বাধে না তার। সোমেনবাবুর স্ত্রী সাক্ষাৎ মাতৃমূর্তি যেন। টকটকে লাল পাড় শাড়ি পরা দুধে-আলতা রঙ খোদাই করা নাক-মুখ-চোখ সোমেনবাবুর সামনে এসে দাঁড়ান। বলেন, অবিনাশবাবু খুব রাগ করে চলে গেলেন। শতদ্রু তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে, কোন গালিগালাজ বা ময়লা স্পর্শ করতে পারে না এই পবিত্র মাতৃমূর্তিকে। সার্থক নাম জ্যোতির্ময়ী।

জ্যোতির্ময়ী আজ প্রথম পুত্রস্নেহে শতদ্রুকে বলেন, একটু খেয়ে যাও বাবা। কখন সকালে খেয়েছ। সুস্মিতা পাশে এসে দাঁড়ায়।

সোমেনবাবু উঠে যাবার সময় স্বগতোক্তির ভঙ্গীতে বলেন, ভূমি সংস্কার আইনটা পাশ হয়ে গেছে। গরীব লোকগুলোর কি করতে পার দেখ শতদ্রু।

শতদ্রু শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাকিয়ে থাকে সোমেনবাবুর দিকে। ঘরের মধ্যে ঢুকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে আসেন সোমেনবাবু, একটা টর্চ এনে শতদ্রুর হাতে দেন। বলেন, একটু সাবধানে যাবে।

॥ ৬ ॥

বাড়ির পথে বাজারের দিকটা একটু ঘুরে যায় শতদ্রু। অঙ্কের কোন গরমিল হয় না। বাজারের পাশে রূপচাঁদের ধেনো মদের দোকানের পাশে একদল লোক হৈ চৈ করছে। ওর পাশ দিয়েই হাঁটতে হবে শতদ্রুকে। এক সময় তার পথ চলা থেমে যায়। পাঁচু রাজভর এন্তার চেঁচাচ্ছে, 'হামলোগ খেতি করতা। জমিন নেহি ছোড়েঙ্গে। জান চলা যায়েগা উস্‌মে কেয়া? শতবাবু খারাব কাম কিয়া? জিতনা কিসান হ্যায় ও লোগকো একাট্টা কিয়া। গরীব কিসানকা সাথ দিয়া। পয়সাবালা বড়া আদমীকা নোকর নেহি হ্যায় শতবাবু।'

বিল্টু চিৎকার করে ওঠে, তুই থাম থাম। 'ঠিকের জমি নিকের মাগ।' এই আছে। এই নেই। পয়সা দাও। জমি আছে। পয়সা নেই। জমি নেই। এক কাঁড়ি পয়সা ঢেলে তবে রক্ষে কত্তে পারা যায় এই জমি। পয়সা থাকে দুবো। চাষ করবো। কার নামে রেকট হলো না হলো দেখার দরকার কি আছে আমাদের। আদা ব্যাপারীর জাহাদের খপরে নাভ কি? বড়নোক জমিদারের

সঙ্গে লেগে নাভ কি ?

অবিনাশ ঘোষালের চোখ শিয়ালের চোখের মত জ্বলজ্বল করে রাতের অন্ধকারে। গুলে নিতাই হারান আজ সিরাজকে সঙ্গে নিয়েছে। ওদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে অবিনাশ।

গুলে হন্তদন্ত হয়ে শতদ্রুর পাশে এসে দাঁড়ায়। বলে, তুমি এত রাত কর কেন বলধিনি ঠাকুর্দা। শালারা তোমাকে মারবার মতলব নিয়েচে। আমাদের কানে এলো কথাটা। তাই দল বেঁধে চলে এনু। কচিরামদার জ্বর। উঠতে পারেনে। বললে, তাড়াতাড়ি যা।

শতদ্রুর চোখে চক্রান্তের ফাঁদটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে দাঁড়ান আর উচিত নয়। তাড়াতাড়ি সবাইকে নিয়ে চলে যেতে হবে। সেই মত কাজ করে শতদ্রু। গুলে হারানদের বলে, চল, দেরি হয়ে গেছে। পা চালা।

অবিনাশ ঘোষাল বলেন, একটা কথা ছিল।

শতদ্রু হাঁটতে হাঁটতেই বলে, পরে হবে।

দূরে দেখা যায় ভবানীবাবুর লাঠিয়াল সোলেমান দাঁড়িয়ে গোঁফের আগায় পাক দিচ্ছে। সিরাজকে দেখে একটু চুপসে যায় সে। সোলেমানের সাড়ে ছ-ফুট লম্বা চেহারার কাছে সিরাজ নগণ্য। কিন্তু সিরাজের প্যাঁচের কাছে সোলেমানের কিছু করার নেই। সিরাজ বার তিনেক জেল খেটেছে। ডাকাতি-কেসে। কিছু দিন হলো ছাড়া পেয়েছে। সোলেমানের বিরুদ্ধে কাঁড়ি কাঁড়ি অভিযোগ। সোলেমান ভবানীবাবুর দারোয়ান। তাই ডাকাতি করলেও ধরা পড়ে না। ডাকাতির মাল গচ্ছিত রাখে। ভবানীবাবুর একটা মোটা আয় এই অন্ধকার পথে। সোলেমানের হাতে বাগ্‌দি পাড়ার ডাকাত-দল। তাছাড়া ওপারের শঙ্খচূড় গ্রামের বিখ্যাত ডাকাতদের নিয়ে তার কারবার। কেউ তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে পারে না। আজকাল সেই দলটায় ভাঙন ধরেছে। সিরাজ জেয়ান ডাকাতদের হাত করে ফেলেছে। ফাঁস করে দিয়েছে সোলেমানের কীর্তি। সোলেমান গচ্ছিত মালের যৎসামান্য-দাম দলের হাতে দেয়। বাকি নিজেই ভোগ করে। অবশ্য দোকানদারদের সঙ্গে মূল সম্পর্কটা অবিনাশ ঘোষালের। অবিনাশ রাতের অন্ধকারে এই সব মাল কেনাবেচা করে। একখানা দোকান তার আছে। গভীর রাত্রি পর্যন্ত খোলা থাকে। চোর ডাকাত থেকে শুরু করে পুলিশ দারোগা পর্যন্ত আসে এখানে নির্দিষ্ট সময়ে। এলাকার লোকজন আড়ালে-আবড়ালে বলে, দিনে অবিনাশবাবুর এক

নম্বরের দোকান। রাতে দু'নম্বরের।

সোলেমান আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে সিরাজের গালে জোরে এক থাপ্পড় মারে। সিরাজ প্রস্তুত হয়েই ছিল, বিকট একটা চিৎকার করে লাফিয়ে ওঠে। দুহাত মুষ্টিবদ্ধ করে সোলেমানের বুকে বার বার আঘাত করে সে। সোলেমান জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে সিরাজকে। পারে না। আবার আঘাত করে সিরাজ। আবার জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে সোলেমান। শেষ পর্যন্ত সিরাজ একটা লাফ দিয়ে ছুটতে থাকে। শতদ্রু গুলে নিতাই হারানদের কাছে এসে বলে, কেটে পড়। কেটে পড় সবাই। দলবল নিয়ে ওরা এখুনি আসবে। সঙ্গে অবিনাশ স্বদিশী আছে। স্বদেশী আন্দোলন করার পর গ্রামে তার এই নামেই পরিচয়।

দূরে দেখা যায় একদল লোক ছুটে আসছে। হাতে লাঠি। কার যেন আর্তনাদ ভেসে আসে কিছু পরেই।

পরদিন সকালে ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে হাজির হয় পাঁচু রাজভর আর তার দুই ছেলে রাজা আর শঙ্কর। কচিরাম গায়ে জ্বর নিয়ে ছুটে আসে। গুলে নিতাই হারাণরাও এসে হাজির হয়। তার সঙ্গে আরো অনেকে আসে। প্রত্যেকের চোখে মুখে ভয়ের ছাপ।

কচিরাম ফিসফিস করে শতদ্রুকে বলে, দাদুন তুমি একটা ব্যবস্থা কর। শালা ভবানী বাঁড়ুজ্যে নিজে না নেগে অবিনেশ স্বদিশীকে ভেজিয়ে দিয়েচে।

একটা সঙ্কটময় মুহূর্ত আসছে তা আগেই ভেবেছে শতদ্রু। কিন্তু তা এমনভাবে এত তাড়াতাড়ি আসবে তা ভাবতে পারে না সে।

মনে পড়ে সৌমেনবাবুর কথা। একটু সাবধানে যাবার কথা বলেছিলেন তিনি। তিনি অবিনাশবাবুর চরিত্র জেনেই একথা বলেছিলেন নিশ্চয়। ভদ্রলোকের দূরদর্শিতা আছে। তার দেওয়া আলো আর সাবধান বাণীতে অনেক কাজ হয়েছে। আগে থেকে সতর্ক থাকলে নিঃসন্দেহে কিছুটা বিপদ এড়ান যায়। তৃপ্তির এক আনন্দ উপভোগ করে শতদ্রু।

শতদ্রু থানায় বড়বাবুর ঘরে এসে দেখে অবিনাশ ঘোষাল একখানা চেয়ার দখল করে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। তার চোখে মুখে বিশ্বজয়ের আনন্দের ফোয়ারা। শতদ্রুর দিকে তাকিয়ে অবিনাশবাবু মুখ বিকৃত করে একধরনের আওয়াজ করেন। শতদ্রু বড়বাবু গোপীনাথ দত্তর সামনে এসে দাঁড়ায়।

গোপীনাথের দুচোখ দিয়ে রঞ্জন-রশ্মি ঝরে পড়ে যেন। শতদ্রুর কোথায় কি আছে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে গোপীনাথ দত্ত।

শতদ্রু বলে, গতকাল রাত্রিতে শ্যামগঞ্জের পাশ দিয়ে আসার সময় সোলেমান আর তার দলবল পাঁচু রাজভর আর তার দুই ছেলেকে ভীষণ মারে।

কেন? গুহার ভেতর থেকে গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে আসে।

কেন জানি না। ঘটনাটা বলার জন্যে আর প্রতিকারের আশায় আপনার কাছে এসেছি।

তুমি কে?

শতদ্রু। বাড়ি ঐশ্বর্যগড়।

কি কর?

পড়ি।

কি পড়?

আই এ।

পড়াশোনা করার সময় পাও?

সময় কি কেউ পায়? সময় করে নিতে হয়।

বা! চমৎকার! চট্‌জলদি বেশ শানান জবাব দিতে পার দেখছি। কথায় তো দিব্যি খই ফুটছে। কিন্তু এই বয়েসে যে কাজ করছো সেটা কি ছাত্রের উপযুক্ত কাজ বলে আমায় মেনে নিতে হবে?

শতদ্রু কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বলে, একজন ছাত্র হিসাবে আমি কতখানি উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত সে বিচার করার ভার তো বিশ্ববিদ্যালয়ের।

ক্রুদ্ধ গোপীনাথ দত্ত বাঘের মত চিৎকার করে ওঠেন। বলেন, একজন ছাত্র কতখানি উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত তা বিচার করার ভার আমার ওপর না থাকলেও রাতের অন্ধকারে সে কি করে বেড়ায় তা দেখার দায়িত্ব আমার আছে বৈকি?

আপনি অহেতুক রেগে উঠছেন, রাতের অন্ধকারে কোন ছাত্র যদি কোন অন্যায় কাজ করে সে সম্পর্কে নিশ্চয় আপনার দেখার অধিকার আছে। কিন্তু তার আগে আমি যে আর্জি নিয়ে এসেছি সে সম্পর্কে কি হবে বলুন? এসো পাঁচু। এসো রাজা-শঙ্কর।

রক্তাক্ত কলেবরে পাঁচু রাজা আর শঙ্কর বড়বাবুর সামনে এসে দাঁড়ায়।

শতদ্রু লিখিত একটা দরখাস্ত বড়বাবুর সামনে রাখে।

গোপীবাবু সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত বয়ানটা শেষ করে বলেন, কার লেখা ?

আমার।

এর মানে বোঝে এরা ?

এদের কথা শুনেই লিখেছি আমি।

ইংরাজী ভাষায় বেশ দখল আছে দেখছি তোমার।

জিনিসটা বুঝলে গুছিয়ে লেখার চেষ্টা করি।

যাহোক যে জমি নিয়ে বিরোধের কথা তুমি লিখেছ সেটা কি রকম ?

কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে ওরা এ্যাণ্ড্রুল কোম্পানীর জমিতে চাষ করে। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন বলে ওগুলো ওদের নামে রেকর্ড হবে। এ নিয়ে ওরা দলবদ্ধভাবে আন্দোলন করছে। সেই আন্দোলন ভাঙার জন্যে জমির দেখাশোনা-করার-মালিক উঠে পড়ে লেগেছেন।

দেখাশোনা করার মালিক মানে ?

জমির আসল মালিক নয়। যিনি দেখাশোনা করেন মাত্র। কেয়ার টেকার।

কিছুক্ষণ শতদ্রুর মুখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে বড়বাবু বলেন, তুমি বলছো ওটা আন্দোলন। ঠিক আছে। তা মেনে নিচ্ছি। চাষীদের জমির জন্যে যদি ওটা করার অধিকার থাকে, তাহলে যার নামে জমি—সেই মালিকের জমি রক্ষা করার অধিকার থাকবে না কেন ?

হেসে ওঠে শতদ্রু। বলে, কথাগুলো গুলিয়ে যাচ্ছে বড়বাবু। জমিতে যারা দীর্ঘদিন চাষাবাদ করছে তাদের অধিকার দেবার জন্যে সরকার ষ্টেট এ্যাকুইজিসন এ্যাক্ট করেছেন ১৯৫৩ সালে। ১৯৫৫ সালে ভূমি সংস্কার আইন করেছেন। চাষীরা নিজস্ব দখল দেখিয়ে মাঠ জরিপে নিজের নাম লেখাবে। এটা তাদের অধিকার। সরকার তাদের জন্যে আইন করেছেন। কিন্তু এই কাজের সময় লাঠি হাতে যারা এগিয়ে যাচ্ছে তারা কি ঠিক করছে ? এদের নেতৃত্ব যিনি দিচ্ছেন—তিনি কি ঠিক করছেন ?

বাপরে কুলোপানা চক্কোর দেখে ভিরমি লাগবার যোগাড়। আইনটা হয়েছে বলে কুলোপানা চক্কোর দেখছেন দারোগাবাবু ? বেশ রসিয়ে রসিয়ে কথাগুলো বলেন অবিনাশবাবু। পরে যোগ করেন হাঁ, ছোটলোকদের মাথায় তোলা হচ্ছে। এর ফল কি হয় দেখবে। শেষের দিকে চেঁচাতে থাকেন অবিনাশ ঘোষাল।

গোপীবাবু কিছুক্ষণ ভেবে নেন। তার পর বলেন, এত মারধর ঠিক হয়নি। কেসটা আমায় করতেই হবে। রোগীকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে। থানার মেঝেয় বসে তখন পাঁচু রাজা আর শঙ্কর যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

আমি ওদের বিরুদ্ধে কেস করবো। ওরা রাত্রিতে আমার বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়েছিল। উত্তেজিতভাবে বলেন অবিনাশ ঘোষাল।

তা আপনি করতে পারেন। পাঁচুর লিখিত দরখাস্তে কখন কোথায় ঘটনা ঘটেছে তা আছে। কারা তখন উপস্থিত ছিল তাও আছে। কে কাকে মেরেছে তাও আছে। তাছাড়া এর একখানা কপি ওরা এম. এল. এ সাহেবের কাছে পাঠিয়েছে।

থানার মাঠে যারা উপস্থিত ছিল তাদের ছাড়া-ছাড়া ভাবটা দানা পাকিয়ে ওঠে। মেহগনি গাছের ওপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যায়। সামনে নদীতে ভোঁ বাজিয়ে একখানা লঞ্চ ছুটে যায় পশ্চিম দিকে।

বড়বাবু মেজবাবুকে ডাকেন। লিখিত দরখাস্তটি তার হাতে দিয়ে কেস করতে বলেন। সেকসান বলে দেন। পাঁচু রাজা আর শঙ্করকে নিয়ে যান মেজ-বাবু। বলে যান, কেস লিখে হাসপাতালে পাঠাবো।

গোপীবাবু বলেন, আর সবাই সরে যাও। অবিনাশবাবু থাকুন। শতদ্রু থাক। আমার কতগুলি কথা আছে।

সবাই সরে গেলে গোপীবাবু বলেন, অবিনাশবাবু বলেছেন তোমার সঙ্গে ডাকাতদের যোগাযোগ আছে। কথাটা শাণিত ছুরির ফলার মত শতদ্রুর বুকে এসে আঘাত করে। আকাশ থেকে পড়লেও নিজেকে সামলে নেয় অল্প সময়ের মধ্যে। বড়বাবুর মুখের দিকে সে দৃপ্ত ভাবে তাকিয়ে ধীর কণ্ঠে বলে, প্রশাসক হিসাবে আপনি যদি এ প্রমাণ পেয়ে থাকেন আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু কেউ যদি তার হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য একথা বলে থাকেন তাহলে বিষয়টা তলিয়ে দেখতে অনুরোধ করবো আপনাকে।

অবিনাশবাবু পাগলের মত চিৎকার করে ওঠেন। আমি নিজে চোখে দেখেছি হারামজাদা সিরাজের সঙ্গে ঘুরছে।

গালাগাল দেবেন না। কোন কিছু দেখে থাকলে, যা দেখেছেন সেটাই বলুন। দয়া করে রঙ চড়াবেন না।

রঙ চড়ান! বলিস কি! কালকের ফোচকে ছোঁড়া।

গালাগাল দেবেন না।

গোপীবাবু ধমক দিয়ে বলেন, আসল কথাটা জানতে চাই আমি। শতদ্রু তুমি গতকাল রাত্রিতে সিরাজের সঙ্গে ছিলে কেন?

আমি সিরাজের সঙ্গে ছিলুম না। সৌমেনবাবুর বাড়ি থেকে ফিরতে রাত্রি হয়ে যায়। শ্যামগঞ্জ বাজারের কাছে এসে দেখি অবিনাশবাবু দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁর কি উদ্দেশ্য ছিল উনিই জানেন। গ্রামে রটে যায় ওরা রাস্তায় আমায় মারবে। কাঁচিরামদা অসুস্থ। বিপদ দেখে গুলে নিতাই হারান সিরাজের সাহায্য চায়। ভাঁটিখানা থেকে ওকে ডেকে নেয়। আমি ওদের বলে দিয়েছি পরবর্তী সময়ে এই ধরনের লোকের সাহায্য দরকার নেই আমাদের। তাতে যা হয় হবে।

এমন সময় টেলিফোন বেজে ওঠে।

রিসিভার কানে তোলেন বড়বাবু। বলেন, কে?

বঙ্কিম মুখার্জী। স্পষ্ট শোনে শতদ্রু।

এম এল এ সাহেব নমস্কার। কি বলুন।

আজ পাঁচু রাজভর রাজা আর শঙ্কর নামের তিনজনকে খুব মেরেছে। শতদ্রুবাবু ওদের নিয়ে আপনার কাছে যাবেন।

উনি এসেছেন। আমার সামনে বসে আছেন। লিখিত দরখাস্ত দিয়েছেন। আমি কেস করে নিয়েছি।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে গোপীবাবু বলেন, শতদ্রুবাবু আপনি বাড়ি যান। আমি যা করার করছি।

শতদ্রু মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বলে, আমি বাইরে আছি। মনে মনে ভাবে সে। কয়েক মিনিটের তফাতে সে শতদ্রু থেকে শতদ্রুবাবুতে রূপান্তরিত হয়েছে। গোপীবাবু তার জ্বলন্ত আগুনের মত মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকেন। এতটুকু মালিন্যের চিহ্নমাত্র নেই সেখানে।

শতদ্রু বাইরে চলে যায়।

গোপীবাবু বলেন, কি দেখলেন?

অবিনাশবাবু ঘাম মুছতে মুছতে বলেন, আগুন।

শুধু আগুন নয়। জ্বলন্ত আগুন। মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখুন, চাষীরা দাঁড়িয়ে আছে। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীকে বেসামাল করে দেন বঙ্কিম মুখার্জী। তাকেও সময়মত খবরটা দিয়েছে ওরা। বেঁধে-ছেঁদে কাজ করছে এ ছেলে। এর সঙ্গে সামাল দেওয়া খুব মুস্কিল।

আপনি খুব কাছা-খোলা। আগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মাল দিইচি। কাজ করিচি। রাতেই যদি উঠিয়ে নিতেন, ল্যাঠা চুকে যেত। হতাশার সুরে কথাগুলো বলেন অবিনাশ ঘোষাল।

সবাই তো একছাঁচে গড়া নয় অবিনাশবাবু। আর সবাই আপনার ফরমাস মত কাজ নাও করতে পারে।

এত বড় স্পর্ধা। এত বড় কথা। শালা কমুনিষ্ট কোথাকার। পাঠাচ্ছি শালা তোকে সাগর গোসাবায়।

যান যান আপনি। আমার সামনে আর আসবেন না।

আসবো। আলবৎ আসবো। আমার ডাইরি লেখাব। তোমার থানার ডিউটি অফিসার আমার ডাইরি লিখবে তোমার সামনেই। এই ডাইরিতেই কেস হবে। ডাকাতি কেস। কাল আমার বাড়ি ডাকাতি কত্তে গিয়েছিল, শতদ্রু সিরাজ পাঁচু রাজা শঙ্কর গুলে নিতাই হারাণরা।

বাওয়ালী মোড়ল জমিদারদের বাড়িতে 'এ্যাটেস্টেশান ক্যাম্প' বসেছে। দল বেঁধে সেখানে গিয়েছিল শতদ্রু। কয়েকজন অফিসার এসেছিলেন সেদিন। তাদের কাছে ঐশ্বর্যগড়ের কৃষকদের কথা বলে শতদ্রু। তার থেকে সব কিছু শুনে, একজন অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এ ব্যাপারে তদন্ত করার জন্যে। মাঠ জরিপ হয়ে গেছে কিন্তু চাষীদের পাত্তা দেওয়া হয়নি। তাই একটা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এখন প্রত্যেক কৃষককে আলাদাভাবে একটা করে দরখাস্ত দিয়ে রাখতে হবে এ্যাটেস্টেশান অফিসারের কাছে। কপি দিতে হবে সি ক্যাম্পে। এ ছাড়া নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত তো করতেই হবে। এই দরখাস্তের ওপর শুনানী হবে।

রীতিমত সাজ সাজ রব পড়ে যায়। লেখার লোকের খুব অভাব। শতদ্রুর ওপর খুব চাপ পড়ে। গরীব চাষীদের কাজ। বেশি পয়সা খরচ করাও যাবে না। চাঁদার পয়সায় কুলোচ্ছে না।

দরখাস্তে জমির দাগ নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। অন্য কিছু থাকুক আর না থাকুক। মাঠের ওপর মৌজা ম্যাপ নিয়ে কৃষকদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে শতদ্রুর মনে হয় একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে চলেছে সে। পাঠান-মোগল যুগে যার সূচনা। ইংরেজ আমলে যার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল সেই ভিত্তিকে ভেঙে চুরমার করে দিতে চলেছে সে। এই বোধটা শুধু নিজের

মাথায় রাখলে চলবে না। সবার মাথায় ঢোকাতে হবে। সবাইকে নিয়ে গুরু-দায়িত্ব পালন করতে হবে।

আজ সূর্যের অফুরন্ত আলোর মধ্যে একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করে শতদ্রু। অন্যান্য দিনের মত এ শুধু সূর্যের কিরণ নয়। কোটি কোটি বৎসর আগে থেকে মহাশক্তির উৎস পৃথিবীকে যে আশীর্বাদে অভিষিক্ত করছে আজ সেই মূক ভাষাটার অর্থ শতদ্রু এক মুহূর্তে স্পষ্ট উপলব্ধি করে। মাঠের ওপরকার দূর্বাঘাসের আগায় যেন কথা শুনতে পায় আজ। শালিকেরা দল বেঁধে যে মহোৎসবে মত্ত তার আনন্দস্রোত স্পর্শ করে শতদ্রুর হৃদয়। কত বাধা কত দুঃখের বেড়াজাল ছিন্ন করে তবে এই আনন্দ। সবাই এই আনন্দের ভাগীদার হোক এটা অনেকে চায় না। তারা দেশে দেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। কবে এই বাধা দূর হবে ?

জোয়ার এসেছে। ভাগীরথীর উদ্দাম স্রোত প্রাণবন্ত। গন্তব্যস্থানের নাম উল্লেখ করতে করতে পাল তোলা নৌকো ছুটেছে। হঠাৎ মনে হয় এরি সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে জীবনস্রোত। যদি ছুটতে না পারা যায় ? মৃত্যু। হাসে শতদ্রু।

গতকালের ঘটনায় আর কিছু না হোক কৃষকদের মধ্যেকার প্রাণশক্তি এগিয়ে যাবার জন্যে প্রেরণা পেয়েছে। তাই আজ এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আজ মাঠে এসেছে সবাই। কৃষক একা নয়। তার পরিবারের আরো অনেকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে কানুনগো এসে উপস্থিত হন। আপন আপন জমি দেখিয়ে দেয় কৃষকেরা। দাগ-নম্বর ঠিক করার কাজে শতদ্রু সাহায্য করে। মাঝে মাঝে মুচকি হাসে পঞ্চু মোড়লের দিকে তাকিয়ে। বলে, 'গুরু তোমার থেকে শেখা বিদ্যে।'

'ভবে কে কার গুরু—কে কার চেলা—' গান আরম্ভ করে দেয় পঞ্চু মোড়ল। সমস্ত পরিবেশটা জমজমাট হয়ে ওঠে।

কানুনগো হরেন শিকদার বলেন, আপনাদের মধ্যে শতদ্রুবাবুর মত একজনকে পাওয়া খুব ভাগ্যের কথা।

পঞ্চু আবার গায়,

'ওকে আসতে হবে
এ কাজ করতে হবে
এটাই তো ভাই রফা।

গান শেষে সবাই হেসে ওঠে। বলে, শশী মোড়লের চ্যালা।

দূর থেকে দেখা যায় কারা যেন আসছে। ক্রমে মুখগুলো স্পষ্ট হয়। সোলেমানের সঙ্গে জন দশেক লোক। অবিনাশ ঘোষালও আসেন তার সঙ্গে। কাছে এসে কানুনগো হরেন শিকদারের দিকে দৃষ্টি রেখে বলেন অবিনাশবাবু, কানুনগোবাবু এরা সব ভবানীবাবুর জন-মজুর। ভবানীবাবু জমির মালিক। তার জমিতে এরা মজুরী-খাটা-লোক আপনাকে ভুল বোঝাচ্ছে। জমি বন্দোবস্ত নিয়ে এরা চাষ করে না।

অবিনাশবাবু আপনার সঙ্গে আসা লোকেরাই বলবে এ জমিতে কারা চাষ করে। কে জমির মালিক। কথায় আছে না, কার সাক্ষী কে। কথাগুলো বলে পঞ্চু মোড়ল।

মুখ সামলে কথা বলবি। আমি শুঁড়ি? আমার সাক্ষী মাতাল? তর্জন-গর্জন করতে থাকেন অবিনাশ ঘোষাল। বিশ্রী ধরনের মুখভঙ্গী করে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ দিতে থাকেন। এর পর হঠাৎ কয়েকজন শতদ্রুকে ঘিরে ফেলে। উপস্থিত সবাই কিছুক্ষণ বোকার মত হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। আসল ব্যাপারটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চু কচিরাম হারান গুলেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। ততক্ষণে কাজ হাঁসিল করে চলে যায় সোলেমানরা। শতদ্রু ধরাশায়ী হয়ে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকে।

'চল শালাদের দেখে আসি।' বলে একদল এগিয়ে যেতে চায়। তাদের নিরস্ত করে শতদ্রু। রক্তাক্ত শরীরে বলে, আমায় হাসপাতালে নিয়ে চল।

॥ ৭ ॥

জ্ঞান ফিরে এলে শতদ্রু দেখে—ডাগর দুটো চোখ তার সামনে। চোখ দুটো আবার বন্ধ হয়ে যায়। ধীর কণ্ঠে বঙ্কিমবাবু বলেন, কথা বোলো না। কোন ভয় নেই। তোমার মা বাবা পাশেই আছেন। কচিরাম পঞ্চুরাও আছে।

ডাক্তারবাবু বলেন, এম এল এ সাহেব আজ সকাল থেকে এখানে আছেন। শতদ্রু আরামে চোখ বোজায়।

কিছু পরে পঞ্চু আসে। বলে, আজ বিকালে আমরা মিটিন কচ্চি। বঙ্কিমবাবু থাকবেন। আজ সারা গাঁয়ে খবর দেয়া হয়েছে। এখানে লোক

থাকবে। তুমি নিশ্চিন্তে থাক। রাতে আবার আমরা আসবো।

শতদ্রু চোখ বোজায়।

সারাটা রাত্রি মাঝে মাঝে চোখ খুলে যায়। আবার বন্ধ হয়। কষ্টের মধ্যেও শতদ্রুর মনে হয় শয়তানদের যুদ্ধে পরাস্ত করে গরীব কৃষকদের জয়ী করতে হবে। কষ্ট যা হয় হোক। মূল্য তো দিতেই হবে। এ পৃথিবীতে বিনামূল্যে কিছুই পাওয়া যায় না।

সকালের রোদ্দুর ঝরে পড়ে বিছানার ওপর। ধীরে ধীরে চোখ খোলে শতদ্রু। সিস্টার এসে বলেন, চা খাবার অভ্যাস আছে শতদ্রুবাবু?

আছে।

মুখটা ধুয়ে নিন। সবিতা চলে এসো। শতদ্রুবাবু জেগেছেন।

শতদ্রু বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে জল আর গামলা নিয়ে আসা মেয়েটির দিকে। দ্বিধা সঙ্কোচ না করে সবিতা বলে, আমি সবিতা। গোরাচাঁদ চক্রবর্তীর মেয়ে। আমার বাবাও জমির প্রজা। আমার বাবাকে আপনি চেনেন?

হাঁ। আপনি!

আপনি আমাদের জন্যে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাই চাষীরা বসে একমত হয়ে এই ব্যাপারটা ঠিক করেছে। এখানে একজন লোক দেবার দরকার। তাই হিসাব করেই আমাকে পাঠান হয়েছে। রাত্রিতে আশেপাশে লোকজন থাকে। দিনেও থাকবে।

জ্ঞানদাময়ীকে নিয়ে সর্বাণী আসেন। বলেন, সারাটা রাত জেগে কাটালে মা?

আমার ওপর চাষীরা যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা আমায় পালন করতে হবে মা। আপনারা আশীর্বাদ করুন, তা যেন ঠিক ঠিক পালন করতে পারি।

তোমার বাবা একজন নিষ্ঠাবান—

কথা শেষ হতে দেয় না সবিতা। বলে, আজকে আমাদের সে পরিচয় নেই মা। আমার বাবা গরীব কৃষক। তার জমিজমা—তার সম্মান—ইজ্জত রক্ষা করার জন্যে এই কাজকর্ম চলেছে। আমার ছোট্ট পরিবারের মুখের অন্নের জন্যে এই কাজ চলেছে। এটাই সবচেয়ে বড় কথা।

এর মধ্যে মুখ ধোয়া হয়ে যায় শতদ্রুর। হাতটা মোছার জন্যে কাপড় খোঁজে সে। সবিতা এতটুকু দ্বিধা সঙ্কোচ না করে নিজের আঁচলের একাংশ

এগিয়ে দেয়। অসঙ্কোচে তা ব্যবহার করে শতদ্রু।

জ্ঞানদাময়ী সর্বাণী দু'চোখ ভরে দেখেন—দুই পবিত্র আত্মার এই অসঙ্কোচ পদক্ষেপ।

অনেকগুলো সেলাই করতে হয়েছে। নির্দয়ের মত মেরেছে শয়তানেরা। জ্ঞানদাময়ী শতদ্রুর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। মনে মনে বলেন, একদিন ছিল—যখন ওরা শুধু মারত। ঘর বাড়ি ভেঙে দিত। টোকা-পানার মত ভেসে বেড়াতে হতো গরীব মানুষদের। কোন ঠাঁই পাওয়া যেত না। জীবন-ধারণের উৎসটুকু পর্যন্ত হারিয়ে যেত। মৃত্যু এসে গ্রাস করতো পরিবারের পর পরিবারকে। কথাটা একদিন শতদ্রুকে বলেও ছিলেন তিনি। এর জবাবে শতদ্রু বলেছিল, জান ঠাকুরমা মহাজন জোতদারেরা কি নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করে চলেছে। শোষণের জাঁতাকলে পড়ে জমি-জিরেত বাস্তুভিটে ঘরবাড়ি হারাচ্ছে মানুষ। ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত হচ্ছে। ক্ষেতেও কাজ জুটছে না। রেল-স্টেশনে হাটে-বাজারে শহরে শহরে ভিক্ষা করছে পেটের দায়ে। কত ধরণের নোংরা কাজ করছে। রাস্তাঘাটে মরেছে। এমন-দিনে বিজ্ঞের মত অনেকেই বলছেন, সমাজে খারাপ কাজ বেড়ে যাচ্ছে। এর জবাব তো একটাই। এই পৃথিবীতে সবার বাঁচার অধিকার আছে। সেই অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করলে যে কোন পথ ধরে বাঁচতে তো তারা চাইবেই। জীবন যে সবার কাছে বড় প্রিয় বস্তু। এর জন্যে আজ পাল্টা ব্যবস্থা হয়েছে।

সবিতার কর্তব্যবোধ আর সেবাযত্ন দেখে সবাই মুগ্ধ। বয়সের-দোষে কয়েকজন অল্পবয়সী নার্স অবশ্য চোখ টিপে হাসে। সবিতার চোখে এই হাসি ধরা পড়লে—পাথরের মত দাঁড়িয়ে যায়। বলে, হাসছেন কেন দিদি?

এমনি।

কারণ না থাকলে দুনিয়ায় কিছুই এমনি হয় না। যে জিনিসটাকে কারণ হিসাবে খাড়া করেছেন তার সম্পর্কে আপনাদের অনেক কিছু জানা প্রয়োজন। শতদ্রুবাবু আমাদের এলাকার মেরুদণ্ড। তাই এই আক্রমণ ওঁর ওপর। শতদ্রুবাবুদের অবস্থা ভাল নয়। গরীব পুরোহিতের ছেলে উনি। টাকা দিয়ে আপনাদের জেলা হাসপাতালে লোক রাখার ক্ষমতা ওঁদের নেই। অথচ ওঁর শরীরের জন্যে আর আমাদের নিজস্ব বিশেষ-প্রয়োজনে ওঁর কাছে একজনকে রাখতে হবে। উনি লড়ছেন যাতে আমাদের সারা বছরের অন্নে ছাই না পড়ে। তাই আমাদের জমি বাঁচাবার জন্যে—ওকে সারিয়ে তোলা আমাদের কর্তব্য।

ওঁকে এখানে চোখে চোখে রাখাও দরকার। সে লোকজনও আছে এখানে-ওখানে। তার মধ্যে আমিও একজন। এর পর মুখে হাসি এনে বলে, শতদ্রু-বাবু মা ঠাকুরমার আদর-যত্নে মানুষ। আমি আজ যদি তার কিছুটা পূরণ করতে পারি মন্দ কি!

সমস্ত কথা মন দিয়ে শোনে সিস্টার তরু চৌধুরী। তার অভিজ্ঞতার দিগন্তে এক নতুন দৃষ্টান্ত দেখা দেয় যেন। এখন কাজ নেই। তাই মিষ্টি মেয়েটিকে নিয়ে একান্তে কিছু কথা বলতে চায়। তার মনটা বড় আনচান করে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে। অন্তস্থলে তার যে ফল্গুধারা প্রবাহিত—তা প্রতি মুহূর্তে বিব্রত করে তোলে তাকে। তরু বলে, চলো।

চলুন। তরু চৌধুরীর সঙ্গে এগিয়ে চলে সবিতা।

ঘরের এক কোণে বসে মুচকি হেসে তরু বলে, আমারও তো চোখ আছে ভাই। দেখছি তোমার কাজটা নীরস কর্তব্য পালন নয়। এর মধ্যে মনের ছবিটাও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে প্রতি মুহূর্তে। আমিও তো মেয়ে। আমার চোখে এসব ধরা পড়বেই।

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকে সবিতা। পরে ধীরে ধীরে বলে, এত বড় একটা মরা-বাঁচার যুদ্ধ। যেখানে কয়েক শত মানুষের জীবন আর তাদের পরিবারের জীবন যুক্ত—সেখানে এই ব্যাপারটার কথা আমি ভাবতেই পারি না। যেখানে যা প্রয়োজন তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি মাত্র। একজন অসুস্থ মানুষ শুয়ে পড়ে আছেন। তার জন্যে চাই সেবা যত্ন আন্তরিকতা। সেই প্রয়োজনটা পূরণ তো করতেই হবে। মেরুদণ্ড সোজা হয়ে না দাঁড়ালে—পুরো শরীরটা কর্মক্ষম হবে না। রোগীটাকে কর্মক্ষম করে তোলাই এখন আমাদের লক্ষ্য দিদি। সেই আদর্শ বোধে আপনারাও তো দিন রাত কাজ করে যাচ্ছেন।

তরু বলে, আমরাও তো সারা সমাজ শরীরের সুস্থ অবস্থা কামনা করি। আমাদের মধ্যে এই একই ধরনের আদর্শ কাজ করছে। তার প্রেরণাতেই তো রাত দিন দুরূহ কাজ করে চলি। এ ছাড়াও ব্যক্তি-জীবনে কি কোন বিশেষ প্রশ্ন থাকতে পারে না? একাত্ম-বোধ থেকেই তো সমাজ-স্বীকৃত একটা বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হচ্ছে এই জগৎ সংসারে।

মুখখানা রক্তিম হলেও সবিতা খুবই হাল্কা সুরে বলে, দিদি—শতদ্রু-বাবুর দুর্ঘটনার আগে তাকে চিনতুম না। বাবার জমি বাঁচাবার কাজে এসে তার সঙ্গে পরিচয়। এই অবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে আপনার এই প্রশ্নের জবাব

দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তরু অতি স্পষ্ট ভাবে দেখতে পায়—সবিতার মুখের বিষণ্ণতা ভেদ করে এক ঝলক মৃদু হাসি বেরিয়ে আসে। সবিতা তরু চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখের পলক পড়ে না।

তরু বলতে থাকে, আমার খুব ভাল লেগেছে। একটা জীবন্ত কাব্য আস্বাদন করছি আমি। জানি না এর পরিণতি কোথায়। আজ এইটুকু শুধু বলবো—তোমার জীবন আনন্দে ভরে উঠুক।

এটা আপনার দৃষ্টিভঙ্গী। অনাদিকাল থেকে আষাঢ়ের কালো মেঘের ঘনঘটা অনেকেই দেখেছেন। কিন্তু মহাকবি কালিদাসের চোখে এ মেঘ শুধু মেঘ নয়। দয়িতের অন্তর্বেদনা।

তরু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। বলে, হাঁ। চোখ থাকলে দেখা যায়। অনেক জিনিসই আমরা দেখতে পাই না—চোখের অভাবে।

সবিতা কপালের এলোমেলো চুলগুলি গুছিয়ে বলে, আপনাকে দিদিই বলি। সবাই সিস্টার বলে। সেই সাদামাঠা অর্থে নয় কিন্তু। আজকের দিনে আপনি আমার জন্যে ভেবেছেন। সেই হিসাবে আপনি আমার আপন-জন। আমরা দু'জনেই পৃথিবীতে মেয়ে হয়ে জন্মেছি। তাই আপনার বা আমার একজন পুরুষের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কযুক্ত হতে বাধা নেই। পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে হাঁটতে হাঁটতে উভয়ের স্বীকৃতিতে জীবনের এক বিশেষ অধ্যায়ে আসতেও পারি। বিশেষ এক গুণে বা আদর্শেই তো পরস্পরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায়। সেখানে ঘাটতি থাকলে তা হবে না দিদি। সে অনেক পরের কথা। এখন তো শুধু চলা—আর কাজ করে যাওয়া।

তরু চৌধুরী হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সবিতার মুখের দিকে। কত সহজে নিজের মনের কথাটা বলে যায় মেয়েটা। দৃষ্টিভঙ্গী কি পরিচ্ছন্ন। আরো কিছু দিন পাশাপাশি হাঁটার পর ওদের জীবন মধুময় হোক।

খাবার পর একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল শতদ্রু। ঘুম ভাঙলে আজ মায়ের হাসি হাসি মুখখানা দেখতে পায়। সবিতা গ্লাসে দুধ এনে দাঁড়ায়। শতদ্রু উঠে বসে। হাত বাড়িয়ে দেয় সবিতার দিকে। দুধ নিয়ে বলে, এই কটা দিন তুমি বুঝতেই দিলে না যে আমি হাসপাতালে আছি।

সর্বাণী বলেন, ওর তুলনা হয় না। গোরাচাঁদবাবুর মেয়ে এত চমৎকার—

কথা থামিয়ে দিয়ে বলে সবিতা, আমি কি শুধু গোরাচাঁদবাবুর মেয়ে।

অহল্যা-বাতাসীদের কেউ নয় ? শতদ্রু পঞ্চু কাচিরামদের দলের লোক নয় ?

হাঁ মা—তুমি কৃষকদের জমি রক্ষার লড়াইয়ের লোক। বলেন সর্বাণী।

ধীর পায়ে পাশে এসে দাঁড়ায় তরু চৌধরী। বলে, মেয়েরাও কম কিসে মা। লড়াইয়ের ময়দানে পুরুষের পাশাপাশি তারাও হাতিয়ার নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে।

হাঁ মা। এই আশীর্বাদ করি লড়াইয়ের ময়দানে তোমরা যেন এগিয়ে যেতে পারো। হুমকীর কাছে মাথা নত করে—পঙ্গুর জীবন যাপন করছি আমরা। এভাবে বাঁচা তো বাঁচা নয়। আমাদের দিন শেষ। তোমরা এই ব্যবস্থা মেনে নেবে কেন ?

সর্বাণী টুলে বসে শতদ্রুর মাথায় হাত বোলাতে থাকেন। বলেন, ঠাকুমা তোর জন্যে বড়া ভেজে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আরে বাপ্‌রে !

তরু চৌধুরী অনেক মাকে দেখছেন কিন্তু এই ধরনের মাকে এই প্রথম দেখলেন। সর্বাণীর দিকে খুঁতিয়ে খুঁতিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলেন, দু'চার দিনের মধ্যেই ছেলেকে নিয়ে যাবেন মা।

কথাটা বলার পর তরু নিজেই কেমন যেন চম্‌কে ওঠে।

সবিতা বলে, মাসীমা আজ আমি আপনার সঙ্গে যাবো। মায়ের শরীরটা ভাল নয়।

তোকে রোজ বলি মা। আমি আসবো মাঝে মাঝে। পালা করে থাকব। সে কথা তো তুই শুনবি না।

তরু বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে শতদ্রুর দিকে। সবিতার সেবাযত্ন আর আন্তরিকতা যে শতদ্রুর হৃদয়কে স্পর্শ করেছে তা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করে এই মুহূর্তে। সাথে সাথে তার বঞ্চিত জীবনের হাহাকার পুঞ্জীভূত হয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে আসতে চায় যেন। বেশ কিছুদিনের রুটিন-মাফিক কাজের যাঁতাকলে হৃদয়াবেগ-প্রশমনের সংযম সৃষ্টি করার আপ্রাণ চেষ্টা করেও সফল হয় না সে। থরথর করে কাঁপতে থাকে আজ। ধরা পড়ে যাবে নাকি ? শতদ্রুর আচার-আচরণ কথাবার্তা আর দুটো চোখ প্রতিটি মুহূর্তে তার মনটাকে কাছে টানছে। কাছে আসার চেষ্টা করেছে আপ্রাণ কিন্তু পাখনার আড়াল দিয়ে সেখানে সবিতার অবস্থান তাকে পা বাড়াতে দেয়নি। তবু মাঝে মাঝে ফাঁক পেয়ে এগিয়ে গেছে সে। বিস্মিত হয়েছে—এই বয়সে তার

সচেতনতা আর পৌরুষ দেখে। একে দূর থেকে শুধু শ্রদ্ধা করা যায়।

শতদ্রু তরুর মুগ্ধ চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে বলে, আপনি অনেক কিছু ভাবছেন মনে হচ্ছে।

ভাবছি। সবিতার সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা—এর শেষ কোথা?

বিষয়টাকে হাল্কা করে নেয় শতদ্রু। ধীর কণ্ঠে বলে, এই পৃথিবীতে সব কিছুরই তো একটা শেষ আছে। এরও শেষ হবে।

সন্ধ্যা নেমে আসে।

রোগী-দেখা শেষে লোকজন বেরিয়ে যায় হাসপাতাল থেকে। সবিতা সর্বাণীকে নিয়ে বেরিয়ে আসে। তরু চৌধুরী শতদ্রুর বেডের পাশে এসে দাঁড়ায়। ওষুধ খাওয়ানোর পর বলে, আজ কেমন আছেন শতদ্রুবাবু?

আপনাদের সেবা যত্নের তুলনা হয় না। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে আনলেন আমাকে।

আমাদের কাজ তো সব আইন মাফিক। এ কাজের মধ্যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যে মেয়েটা আপনার দেখাশোনা করে যাচ্ছে—তার সেবাযত্নের কি তুলনা হয়? আমি প্রতি মুহূর্তে তা উপলব্ধি করেছি। দেখেছি অতুলনীয় ঘনিষ্ঠতা।

আসলে ব্যাপারটা কি জানেন আপনার চোখে যেটা ঘনিষ্ঠতা, আমার চোখে সেটা শ্রেণীর গাঢ় ঐক্য। ওটা আমাদের মধ্যে থাকবেই। এটা না থাকলে আমরা যা করছি সব মিথ্যে। আমাদের মধ্যেকার ভালবাসাটাই হোল আসল। ওর জোরে অনেক কিছু করতে পারি। যা খুবই দরকার। ওর বাবা 'মার-খাওয়া' লোক। আমার বাবাও তাই। এরই জন্যে লড়াইয়ের ময়দানে আমরা এত কাছাকাছি। ঘনিষ্ঠ। পরস্পরকে অল্প সময়ের মধ্যে ভাল ভাবে চিনেছি। ও আমার দেখাশোনা ভাল ভাবে করবেই।

আগেও সবিতা আপনাদের সঙ্গে এভাবে কাজ করতো?

ওকে জানতুম না। মার-খাবার পর আমাদের লোকেরা ওকে আবিষ্কার করে। সবিতা স্বেচ্ছায় চলে আসে এখানে।

আমার আপনাদের ব্যাপারে এতখানি জানার অধিকার নেই। আপনি কিছু মনে করছেন না তো?

না। মনে করবো কেন। আপনার মনে নিশ্চয় কোন প্রশ্ন জেগেছে। সেই প্রশ্নের সমাধান হওয়া উচিত। আপনি যদি সে ব্যাপারে কোন কিছু জানতে চান—বলবো না কেন? না হলে আপনি তো ভুল বুঝবেন আমাদের।

তরু চৌধুরী এক স্বচ্ছ সলিলা সরোবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে যেন। পাশে দাঁড়িয়ে তার—অভ্যন্তরের সব কিছু জেনে নেওয়া যায় এক লহমায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তরু। হরিদ্বারে গিয়ে নদীতে পয়সা ফেলার পর যেমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল—আজ সে শতদ্রুর মনের গভীরের অনেক কথা জেনে নিল। তেমনি স্পষ্ট। মনে এলো সন্ধ্যায় হরিদ্বারে প্রদীপ ভাসানোর পর এক স্নিগ্ধ মধুর পরিবেশে সে এই ধরনের একজনকেই মনে প্রাণে কামনা করেছিল। তাই অসংখ্য রোগীর ভিড়ের মধ্যে শতদ্রুর দিকে চোখ পড়াটা অস্বাভাবিক নয়। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে।

শতদ্রু বলে, আপনাকে দেখে মনে হয়—কোথায় যেন একটা গভীর দুঃখ আছে আপনার।

আছে ভাই। অস্বীকার করবো না। কিছুক্ষণ থেমে বলে, এক বন্ধু খুব কাছাকাছি এলো। দীর্ঘদিন তার সঙ্গে মেলামেশার পর 'শেষ-চরম' সীমায় পৌঁছাব মনে করে বসে আছি। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল—সে যা বলেছিল সব মিথ্যে। এটাই যদি আধুনিক জীবনের ধরন হয়, তাহলে আজকের জীবনে সত্যের কোন দাম নেই—এটাই প্রমাণিত হয়।

শতদ্রু তরুর চোখের ওপর চোখ রেখে বলে, দিদি আপনার মধ্যে কিছু বোঝার ভুল ছিল। নিশ্চয় আদর্শগত দিকে আপনাদের কোন মিল ছিল না। তাছাড়া দ্বৈতজীবন সব সময় পরিপূরক হবে। হিসাব মিলিয়ে দেখবেন—তাঁর যেখানে অভাব ছিল সেখানে অভাবটুকু আপনি নিশ্চয় পূরণ করতে পারেননি। আর তিনি যদি আপনার অভাব পূরণ করতে না পেরে থাকেন—সেটা তো আপনার ধরে ফেলার কথা। তাই নিশ্চয় আপনার সতর্কতার অভাব ঘটেছে। এই বোঝা-পড়া দেওয়া-নেওয়া সঠিক মত না হলে দ্বৈতজীবনের মূল্য থাকে না। ছোট ভাইয়ের এই কথাগুলো মিলিয়ে দেখবেন।

তরু কাঁপতে থাকে শতদ্রুর কথায়। দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে আসে। বিগত দিনে নীলয়ের জীবনের ফাঁক-গুলি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে সে! মান্ধাতার আমলের অভিমান-সর্বস্ব হয়ে বসে থেকেছে। তাতে কোন কাজ হয় না। দিনের পর দিন ফাঁক বেড়েছে। তার পর এসেছে অনিবার্য বিচ্ছেদ।

ডাক্তারবাবু আসছেন। ক'জন নার্স দূরে থেকে হাসাহাসি করছে। এর অর্থ কি তা তরু বোঝে। কিন্তু কোন প্রতিবাদ করবে না সে আজ।

ডাক্তারবাবু কাছে এসে বলেন, এম এল এ সাহেব ফোন করেছিলেন আমাকে। আমি বলেছি আগামী বুধবার ছুটি দিয়ে দোবো।

শতদ্রু সহাস্যে দু'হাত তুলে নমস্কার জানায় ডাক্তারবাবুকে। বলে, আপনি দায়িত্ব নিয়ে যে অবস্থা থেকে বাঁচিয়েছেন তার জন্যে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

এটাই তো আমাদের কাজ।

শতদ্রু ধরাগলায় বলে, ডাক্তারবাবু আজকের দিনে যন্ত্রের মত আমরা যা করে যাচ্ছি—তাকেই তো কাজ বলছি। কিন্তু হৃদয়ের অনেকখানি উজাড় করে দিয়ে যখন কিছু করতে দেখি—তাকে কি বলবো?

তুমি ছেলেমানুষ। অপারেশান টেবিলে অস্ত্র হাতে নিয়ে যখন কাজ করতে হয়—সে দৃশ্য তো তুমি চোখে দেখ না। দেখলে আমাদের কাজের মধ্যে প্রাণ সম্পর্কিত বিষয়টি কতখানি ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা জানতে পারতে। এতটুকু এদিক ওদিক হলে রোগীর জীবন নিয়ে টানাটানি।

আমি আপনাদের কাজকর্মের ওপর অসতর্ক মুহূর্তে আদৌ ব্যবহার করা যায় না এমন একটি শব্দ ব্যবহার করে ঠিক করিনি। এটা আমার ভীষণ ত্রুটি। অমার্জনীয় অপরাধ। কারণ মানুষের জীবন আর তাদের জীবন-মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে আপনারা যখন কাজ করেন—সে তো হৃদয়-উজাড়-করা ভালবাসা নিয়েই করেন। এটা আমার বোঝা উচিত ছিল। এটা আদৌ যান্ত্রিক নয়।

ডাক্তারবাবু বলেন, তোমার আর সেই সঙ্গে আমার জীবনের একটা অগ্নি পরীক্ষা হয়ে গেল শতদ্রু। তোমার ওপর শয়তানরা বাছা বাছা জায়গায় আক্রমণ করে। মেরে ফেলার জন্যেই। বঙ্কিমবাবু আমার সঙ্গে আলোচনা করে বলেন—কলকাতায় অনেক ভাল ডাক্তার পাওয়া যাবে হৃষিকেশ—কিন্তু তোমাকে তো পাওয়া যাবে না। একজন সিনিয়ার ডাক্তার তুমি। প্রায় সব যন্ত্রপাতিও যখন এখানে আছে—এখানেই ওর চিকিৎসা হোক।

তরু অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শতদ্রুর দিকে। ভাবতে থাকে, এই বয়েসে মানুষ এমন খাপখোলা তলোয়ারের মত জীবনবোধের অধিকারী হয় কেমন করে? কাজ সেরে বাসায় ফিরে আসে তরু। বিছানায় শুয়ে ছটফট করে। একটা চিন্তা তাকে কুরেকুরে খায়। তার ব্যবহারটা ঠিক হয়নি নীলয়ের ওপর! এখনো সময় আছে। তার কাছে গিয়ে অকপটে সব স্বীকার করা দরকার। রাত্রিতে তার চিন্তা বারবার ঘুরপাক খায়। কি ভাবে কথাটা পাড়বে তার কাছে। দাম্ভিকের মত বসে থাকা নয়। সব কিছু পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্ন করে পথ চলাটাই জীবনের উপযুক্ত শিক্ষা।

সকালে পোষাক পরে হাসপাতালের পথে পা দিয়ে দেখা হয়ে যায় সবিতার সঙ্গে। সহাস্যে বলে সবিতা, ভাল আছেন ?

হাঁ ভাই। রাস্তা ভুল করে কখনো কাঁটার-ঝাড়ে পড়ছি। কখনো এঁদো-ডোবায় আছড়ে পড়েছি। এখন শোধরাবার চেণ্টা করছি।

রাস্তা না জেনে রাস্তায় কেউ হাঁটে ভাই ? তাছাড়া জীবন নিয়ে তো ছেলেখেলা করা যায় না। অনেক সময় রাস্তার ওপর নির্ভর করে জীবনের সাফল্য। তাই রাস্তা নির্ণয় করাটা অবশ্যই হবে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত।

তরু সবিতার কাঁধে হাত রাখে। বলে, আজকের দিনে ভাবনা চিন্তা বাদ দিয়ে জোয়ারে ভাসার দলেই বেশি মানুষের ভিড়। তার কারণটাও অবশ্য আছে। দীর্ঘদিন একটা জাতি অন্ধকারে পড়ে পড়ে মার খেয়েছে একটানা। তাই বিচ্যুতিটাও জীবনের প্রতি পদক্ষেপে। জীবন-দর্শন বিহীনদের মধ্যে অবিশ্বাস থাকবেই। জীবন-দর্শন যাদের আছে দৃঢ় পদক্ষেপে তারা এগিয়ে যাবে—হাজার বিপদ-আপদের মধ্যে দিয়ে।

তরু বলে, বেশির ভাগ লোক তো বিশ্বাস বিহীন—এদের চিকিৎসা হবে কি করে ?

কথাটা সঠিক। জীবনের লক্ষ্যবস্তু স্থির করতে পারে না—ইতস্ততঃ লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয় এমন মানুষের সংখ্যাই তো বেশি। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে বঞ্চনা-ক্ষোভ-বুভুক্ষার গগনভেদী চিৎকার। এরাই আজ বঞ্চিতের পর্যায়ে। সমাজের সমস্ত সুখ সৃষ্টি করেও—এতটুকু বাঁচার অধিকার পর্যন্ত পায় না এরা। প্রতি মুহূর্তে স্বার্থান্বেষী মানুষের বাঁকা-বুদ্ধির শিকার হয়। নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে সবাই এদের ব্যবহার করে নেয়। বাঁচার সহজ পথটা ধরতে পারে না এরা—নিজেদের সহজ বুদ্ধিতে। অবশ্য এদের পক্ষে প্রয়োজনীয় পথটা বেছে নেওয়াও আজ খুবই কঠিন—হাজার ধরনের প্রলোভনের মাঝখানে। তবু এটা তো ঠিক—একটা সঠিক পথ খুঁজে বার করতেই হবে।

তাই আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন—এদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে আসল কথাটা বুঝিয়ে দেওয়া। তাহলে প্রয়োজনীয় কাজটা ওরা ঠিক মত করতে পারবেই। এ বিশ্বাস আমার আছে। তাই বিশাল একটা দেশে আমাদের দায়িত্ব অনেক। সবিতা কথা শেষ করেই তরুর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে

নেয়। শান্ত কণ্ঠে বলে, ছোট বোনের মধ্যে যদি কোন ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেয়ে থাকে—মাপ কোরো দিদি।

না না। ও কথা বোলো না। তোমার মত মিষ্টি মেয়ের মধ্যে ঔদ্ধত্য থাকবে কেন? সত্যের তাগিদে যা কিছু বলার—বলেছ তুমি। আমি সেটা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছি। আজ বিকালেই তো ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে শতদ্রুবাবুকে।

আগে থেকেই শতদ্রুবাবুর আজকের কর্মসূচি ঠিক ছিল। হাসপাতাল থেকে সরাসরি একটা সভায় যাবেন। সেখানে এম এল এ বঙ্কিমবাবু থাকবেন। একটু থেমে বলে সবিতা, এখানকার কৃষকেরা উপলব্ধি করতে পেরেছে ঐক্যবদ্ধ না হলে লড়াইয়ে জয়লাভ করা যায় না। তাই পাড়ায় পাড়ায় তারা দল বেঁধে বসছে। সমস্ত কৃষকদের বোঝাচ্ছে। মিছিল বার করছে। মেয়ে পুরুষ বাঁচার-তাগিদে—সেই মিছিলে সামিল হচ্ছে। শতদ্রুবাবুর ওপর অত্যাচারের জন্যে ধিক্কার জানাচ্ছে। এই কয়দিনের মধ্যে ঐশ্বর্যগড় গম্ গম্ করছে। যে কৃষক কথা বলতে পারত না—তাদের মুখে কথা ফুটেছে। গ্রামের একজন কৃষক আছে যাকে সবাই বলে 'কাদার তাল'। আপনার ইচ্ছামত আপনি তাকে কিছু বুঝিয়ে দিন—সে বুঝবে। একটু পরে অন্য একজন যা বোঝাবে—সেটাও বুঝে যাবে সে। সেই ধরনের মানুষ সুবল পাত্র আজ গ্যাসের বাতি নিয়ে মিছিলের সামনে হাঁটে। তার চলন-ভঙ্গী পাল্টে গেছে। কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে কোন কথা বললে তার চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল হয়ে যায়। হাতের কাছে যা কিছু পায়—ছুঁড়ে মারে। এদের মধ্যে ফিরে গিয়ে শতদ্রুবাবু গতিটা আরো বাড়িয়ে দেবেন।

তরু তাকিয়ে থাকে সবিতার দিকে। তার উত্তেজনায়-কাঁপা চোখের তারার দিকে তাকিয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করে। শতদ্রুবাবুর বিশ্বাস ইস্পাতের মত শক্ত। আন্তরিক ইচ্ছাও সেই ধরনের। সেই পথে জোর কদমে হেঁটে চলেছে সবিতা। আজ পর্যন্ত তার কাজ ছিল হাসপাতাল আর এলাকায়। আগামীকাল থেকে হবে—শুধু এলাকায়। আগে হাসপাতাল থেকে কর্মসূচি নিয়ে যেতো সবিতা। কোথায় মিছিল করতে হবে। কোথায় সভা হবে। সারা এলাকায় দিনের পর দিন কাজকর্ম করেছে—কমবয়সী এই মেয়েটা। এত প্রাণশক্তি পায় কোথা থেকে? এক সময় বলেও ফেলে, এত ক্ষমতা তুমি পাও কোথা থেকে।

সবিতা বলে, আপনার সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ভাগীরথী। কোন দিন তার স্রোত না থাকতে দেখেছেন? এর উৎস আছে। অফুরন্ত জলভাণ্ডার আছে। এতেই গতি সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের ক্ষেত্রেও এক মহান আদর্শ সেই অফুরন্ত জলভাণ্ডারের কাজ করে।

এতক্ষণ তোমার থেকে অনেক কথা শুনলুম। এখন ছোট্ট একটা অনুরোধ আছে।

কি?

আজ তুমি আমার বাসায় খাবে। কিছু খাবার নিয়ে যাবে শতদ্রুবাবুর জন্যে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সবিতা তাকায় তরু চৌধুরীর দিকে। তরু বলে, অন্য কিছু ভেবো না। অনেক রোগী আসে। যায়। তাদের কাছ থেকে যা পাইনি তা তোমাদের কাছ থেকে পেলাম। তাই বড়বোনের একটা ইচ্ছা থাকতে পারে না?

সবিতা কোন কথা না বলে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে তরুকে। দূর থেকে দেখা যায় হাসি মুখে বেডের পাশে দাঁড়িয়ে আছে শতদ্রু।

সবিতা বলে, আপনি নার্সদের নিয়ে একটা সংগঠন করুন। খুব তৃপ্তি পাবেন। মানসিক অবসাদ দূর হয়ে যাবে।

॥ ৮ ॥

বিকাল চারটার কাছাকাছি। হাসপাতালের মাঠে অসংখ্য মানুষ। কৃষক সমিতির পতাকা হাতে। মেয়ে পুরুষ। কেউ কোন কথা বলে না। ডাক্তারবাবু কাগজপত্র হাতে দিয়ে বলেন, শতদ্রুবাবু ছুটি আপনার। সাবধানে থাকবেন। ওষুধপত্রগুলো খাবেন নিয়মিত।

আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনি আমার প্রাণ দান করেছেন। আপনি আমার কাছে দেবতা।

এমনভাবে এমন কথা কেউ উচ্চারণ করেনি কোনদিন। বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন ডাক্তারবাবু।

কচিরাম পণ্ডু সবিতারা হাত ধরে এনে রিক্সায় বসায় শতদ্রুকে। দ্রুত পায়ে কে একজন এসে শতদ্রুর গলায় মালা পরিয়ে দেয়। নিঃশব্দে হাজার খানেক

মেয়ে পুরুষের দুই সারিতে লাইন হয়ে যায়। আর এক চেহারা ফুটে ওঠে সবিতার। মিছিল পরিচালনার। সামনে শতদ্রুর রিক্সা নিয়ে মিছিল এগিয়ে চলে।

জানালা দিয়ে মিছিল দেখে তরু। তার দু'চোখে জল।

আজকের আকাশ মেঘশূন্য। বাতাসে অফুরন্ত প্রাণশক্তি ভেসে বেড়াচ্ছে যেন। শতদ্রুর ইচ্ছা করে—সেও একটা পতাকা হাতে নিয়ে চিৎকার করতে করতে এগিয়ে যায়।

মিছিল এসে শেষ হয়ে যায় চটকলের পাশের বিরাট ময়দানে। সেখানে আজ থৈ থৈ করছে লোকজন। মিল গেট থেকে মিছিল আসছে জোর কদমে। সমস্ত মানুষের স্রোত আজ একই সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যায়।

বঙ্কিমবাবু বলা শুরু করেছেন। 'আমাদের কর্মী শতদ্রু আক্রান্ত হয়েছেন। মাঠ জরিপের সময় যাঁরা মাঠে ছিলেন তারা ভ্যাবাচাকা হয়ে যায় প্রথমে। শতদ্রুকে যারা আক্রমণ করছে তারা খুব ঠাণ্ডা মাথায় ছক তৈরি করেই এসেছিল। কাজ হাসিল করে বেরিয়ে গেছে। এখন থেকে সবাইকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। শত্রুকে ছোট করে দেখা ঠিক নয়। জোতদার জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্যে বিধানবাবুরা জমিদারী ক্রয় আর ভূমি সংস্কার আইনকে এক সঙ্গে কাজে না লাগিয়ে—মাঝখানে প্রায় তিন বছর ফাঁক দিয়েছেন। যাতে জমিদার জোতদারেরা গুছিয়ে নিতে পারে। তাই জমিদারী ক্রয় আইনের ব্যাপারে আমি আর বিনয় চৌধুরী সিলেক্ট কমিটিতে বলি এর মধ্যে দিয়ে কেমন ভাবে জমি চুরি হবে। আমাদের বিরোধী মন্তব্য সিলেক্ট কমিটিতে রেখেছি।

আপনারা শুনে অবাক হয়ে যাবেন, সরকারী দপ্তরে জমির কোন কাগজ-পত্র নেই। তাই জমিদাররা খেয়াল খুশি মত বেআইনী ভাবে আমলনামা চেক-দাখিলা দিয়ে জমি বন্দোবস্ত দিচ্ছে। আপনাদের ঐশ্বর্যগড়ের জমিতে দীর্ঘদিন কৃষকেরা চাষাবাদ করছেন। সেখানে দেখবেন এনড্রুল কোম্পানীর কোন সাহেব বা ভবানীবাবু চেক দাখিলা কেটে নিজেদের পেটোয়া লোকদের জমির প্রজা করে দিয়েছেন। আসল চাষীরা ফাঁক। বর্তমান জরিপের সময় আসল প্রজাদের সঙ্গে ঝগড়া বাধবেই। চাষীরা জমির দখল ছাড়বে কেন?

আহা কি সুন্দর ব্যবস্থা! জমিদারবাবুদের আদরের-দুলাল ভেতরে-বাইরে বাম-হাতের-কাজ সুকৌশলে হাসিল করার চোস্ত কারিগর—নায়েব-

গোমস্তাবাবুরা এখন সরকারী কর্মচারী। তাই ভূমিরাজস্ব বিভাগের অফিসে জমিদারবাবুদের প্রভাব বেশি থাকবে না গরীব কৃষকদের থাকবে—তা আপনারা ভাল ভাবে বুঝে নিন।

জমিদারী কেনা হলো। এই আইনের মজাটা কোথা দেখুন। ৪ ধারা অনুসারে জমিদার বা মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের জমি পয়সা দিয়ে কিনলেন সদাশয় সরকার বাহাদুর। এই আইনের ৬ নম্বর ধারায় বাস্তু-ভিটে বাগান-বাগিচা, মেছো-ঘেরি ইত্যাদি ইচ্ছামত পরিমাণ নিজের দখলে রাখতে পারবে—সে আইনও তৈরি হলো। তাহলে কাদের জন্যে এই জমিদারী বা মধ্যস্বত্ব কেনা হলো? জমিদাররা ইচ্ছামত জমি সরিয়ে রাখলে—কতটুকু জমি বাঁচবে? এর জন্যে আমরা বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ চেয়েছিলাম। বর্তমান সরকার জোতদার জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করেছেন। তাদের তাঁবেদার আর পেটোয়াদের তুষ্ট করেছেন।

গরীব কৃষকদের জন্যে ওরা কি করেছেন? 'লাঙ্গল যার—জমি তার' এই শ্লোগান তুলেছেন জোর গলায়। এটা ভড়ং ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা যদি আমাদের আন্দোলনের ধারা তীব্র থেকে তীব্রতর করতে পারি—তাহলে একদিন না একদিন—সমস্ত জমিচোরদের থেকে জমি অবশ্যই ছিনিয়ে আনতে পারবো।

কথার শেষে জনসমুদ্র থেকে উল্লসিত মানুষের করতালি ধ্বনি ওঠে।

জমিদারবাবুরা কতটা জমি রাখতে পারবেন? তার একটা পরিমাণ বা সিলিং স্থির হয়েছে। তার বাইরেও কিন্তু তারা জমি রেখে দিচ্ছেন। এখন পঁচিশ একর জমি পরিবার পিছু রাখার কথা। কিন্তু এরা আইন অমান্য করে বেশি জমি রাখছেন। এরা মাথা-পিছু পঁচিশ একর জমি রাখার ব্যবস্থা পাকা করেছেন। তাছাড়াও বেনামে ঠাকুর-চাকর-গরু-পাখির নামেও জমি বেনাম করে রেখেছেন। এই জমি রাখার পক্ষে ওরা 'বি' ফরম জমা দিয়েছেন। এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আছে। একদিন না একদিন এই সিলিং ব্যবস্থা আমরা ভাঙবই। কথা শেষে জনতা হাততালি দেয়। শ্লোগান দেয়।

বক্তৃতার মধ্যেই একসময় বলেন বঙ্কিমবাবু, এই মঞ্চের একপাশে এসে বসেছেন শতদ্রুবাবু। আমাদের এই এলাকার একজন লড়াকু-কর্মী। জমির মালিক গুণ্ডা পাঠিয়ে তাকে প্রায় শেষ করে দিয়েছিল। জমির মালিকের সঙ্গে যোগ দিয়েছে তার পেটোয়া-দালাল। শতদ্রু কোন রকমে বেঁচে উঠে আজ আপনাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

শতদ্রু দু'হাত তুলে নমস্কার জানায় জনতার উদ্দেশ্যে। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের গর্জনের মত শ্লোগান ওঠেঃ দখল যার—জমি তার। মালিকের গুণ্ডাবাহিনী—হুঁশিয়ার। অহল্যা-বাতাসীর দেশে মা বোনেরা—এক হও। জমির লড়াই—চলছে চলবে। কৃষকদের জমি থেকে উৎখাত করা—চলবে না। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী—জিন্দাবাদ।

সবিতা শতদ্রুর কাছে এসে দাঁড়ায়। দাঁড়ায় কচিরাম পঞ্চু হারান গুলে নিতাই।

সভাপতির অনুরোধে শতদ্রু বলতে ওঠে। প্রথম থেকেই তার কণ্ঠ দিয়ে আগ্নেয়গিরির লাভা বার হতে থাকে। ক'জনকে শেষ করবে ওরা। রক্তবীজের বংশ। শেষ করা যাবে না। আমরা অন্যায় অবিচার মানবো না। মাটির মানুষ আমরা। মাটির অধিকার চাই। এর জন্যে লড়াই চলছে আদি কাল থেকে। জমিচোর জোতদার জমিদারদের সঙ্গে সে লড়াই আজো চলছে। সবাই জোট বাঁধো। তৈরি হও। মাটি ছাড়া কৃষকদের জীবন বৃথা। তাই যতই রক্ত ঝরুক। আমরা তৈরি। জমি আমরা ছাড়ব না।

বঙ্কিমবাবু হাসেন। সারা মাঠে তখন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। একসময় শতদ্রুকে কাছে ডেকে বঙ্কিমবাবু বলেন, তুমি চমৎকার বল।

বাড়ির পথে সবিতা আজ সঙ্গী। কাঁধে ঝোলা। আঁটসাঁট করে কাপড় পরা। এ এক নতুন সবিতা। শতদ্রু বার বার তাকায় তার দিকে। আজকের আন্দোলনে এদের অবদান সম্পর্কে চিন্তা করতে করতে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলে শতদ্রু।

চৈত্রের সন্ধ্যা নেমে আসে। দক্ষিণ দিক থেকে একটানা বাতাস বয়ে যায়। বাবলা সারির মধ্যে একটা শির শির মিষ্টি আওয়াজ ওঠে। আকাশভরা উজ্জ্বল নক্ষত্র। একটা নতুন জগৎ সৃষ্টি করে যেন। শতদ্রু বলে, ভারি চমৎকার আবহাওয়া।

অনেকদিন পর বাইরে এসেছেন তো!

হাঁ।

আজ শতদ্রুদের বাড়ির উঠোন লোকে লোকারণ্য। কচিরামরা আগে থেকে ঠিক করে রেখেছে—চাষীরা রাত্রিতে খাবে এখানে। দুটো হ্যাজাকের আলো জ্বলছে। রান্নার পাশে জ্ঞানদাময়ী সর্বাণী সবিতাকে নিয়ে বসে থাকে। সব

কিছু দেখে। সমস্ত চাষীদের মধ্যে ভীষণ উৎসাহ। জল আনে। বাটনা বাটে। পাতা কেটে আনে। সর্বাণী বলে, সবাই ঐক্যবদ্ধ হলে কত বড় শক্তি। চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। আজ মিটিংয়ে না গেলে—চিনতেই পারতুম না বাড়ির বাইরের এই নতুন জগৎটাকে।

জ্ঞানদাময়ীর চোখ দুটো আজ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। নিজের বুকে হাত বোলাতে বোলাতে বলেন, বুকের ব্যথাটা অনেকটা কমেছে। ভেবেছিলুম ব্যথা নিয়েই বুঝি ওপারে যেতে হবে। দাদা ভাই আমার ব্যথায় ঠিক-ঠিক মলম দিয়েছে।

সবিতা এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে শতদ্রুর দিকে। চট-চাটাই মেলে চাষীদের মাঝখানে বসে কদিনের অভিজ্ঞতার কথা শুনছে মন দিয়ে। মুখটা তার এক অস্বভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল। সর্বাণী বেশ কয়েকবার সবিতার দিকে তাকিয়ে বলে, মা তুমি একঘটি জল নিয়ে যাও ওখানে। অনেকক্ষণ কথা বলছে সবাই। নিশ্চয় জলতেষ্টা পেয়েছে।

ওদের তেষ্টা কি এক ঘটিতে মিটবে? যাহোক যাচ্ছি।

অনেক রাত পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া সেরে পরের দিনের কাজকর্ম ঠিক করে কচিরাম গুলে নিতাই হারান পঞ্চুরা বিদায় নেয়। সবিতাদের পাড়ার লোকজন সবিতা আর তার বাবাকে নিয়ে পথে বার হয়। পাঁচু একটা হ্যাজাক উঁচিয়ে ধরে বলে, চলুন আপনারা—অনেক দূর যেতে হবে তো।

পাঁচুর হাতের-আলোয়—অসংখ্য মানুষের সঙ্গে সবিতার যাত্রা, দেখার মত একটা দৃশ্য। শতদ্রু খুঁতিয়ে খুঁতিয়ে তা দেখে। কিছু দূর এগিয়ে সবাই লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মন্দিরের সামনে এসে প্রণাম জানায়।

বাড়িতে আর কেউ নেই। একটা হ্যাজাক জ্বলছে উঠোনে। আলোর পাশে অসংখ্য পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ডোবাটার ধারে উচ্ছিষ্ট-পাতা ফেলার জায়গায় অসংখ্য কুকুরের চিৎকার। দু'একটা কুকুর বাড়ির মধ্যেও ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতক্ষণ অসংখ্য মানুষের সঙ্গে থাকার পর একটা নীরব-শূন্যতা উপলব্ধি করে শতদ্রু। বারান্দায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মন্দিরের চুড়োর দিকে তাকিয়ে সে টুকরো টুকরো অনেক কিছু ভাবতে থাকে। বার বার তার চোখের সামনে তরু চৌধুরীর মুখখানা কেন ভেসে ওঠে তা বুঝে উঠতে পারে না।

রাজেশ্বরকে খেতে দিয়ে মুচকি হেসে সর্বাণী বলে, কি গো অনেক রাতে

খাচ্ছ। কষ্ট হচ্ছে নাকি?

কি যে বল। এই মহোৎসব। এখানে কষ্ট কিসের?

জ্ঞানদাময়ী পুত্রের পাতের দিকে দুধের বাটিটা এগিয়ে দিয়ে বলেন, শেষের ভাতগুলো দুধ দিয়ে খা বাবা।

সবাই ঘরে যাবার পর সর্বাণী একটা চিঠি দেন শতদ্রুর হাতে। বলেন, তোর ওপর আক্রমণ হবার পরের-দিন সৌমেনবাবুর মেয়ে এসেছিল। খুব ভাল মেয়ে। চিঠিখানা তোকে দেবার জন্যে দিয়ে গেল।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে মায়ের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে শতদ্রু। কি যেন জিজ্ঞাসা করে। মা বেশ খানিকক্ষণ পুত্রের মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকার পর—মুখ নীচু করেন। শতদ্রু চিঠিখানা নিয়ে বহুদিন পরে নিজের কামরায় গিয়ে ঢোকে। হ্যারিকেনের আলোর জোর বাড়িয়ে—চিঠিখানা পড়তে থাকে।

প্রিয় শতদ্রুবাবু,

আপনার ওপর বর্বরের মত আক্রমণ চালালেন অবিনাশবাবু। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থে। এর সঙ্গে ভবানীবাবুদেরও যোগ ছিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমি আপনার মনের অনেকখানি পরিচয় পেয়েছি। আপনি এই সংকীর্ণ নীতির ঘোরতর বিরোধী। আমি মনেপ্রাণে আপনার এই আদর্শকে বিশ্বাস করি। সম্মান করি। দেশের অবহেলিত মানুষদের আজ দেখবে কে?

আপনি শুনে বিস্মিত হবেন—একদিন অবিনাশবাবু ভবানীবাবুকে নিয়ে বাবার কাছে এসেছিলেন। বাবাকে ওরা বোঝাবার চেষ্টা করেন—জমির ব্যাপারে ওদের কোন দোষ নেই। বরং এনড্রুল কোম্পানীর কেনা জমিতে হামলা করতে যাচ্ছে শতদ্রুরা—একপাল লোকজন নিয়ে। সব শুনে বাবা একটা জায়গায় শক্ত হয়ে দাঁড়ান। তিনি বলেন, কেনা জমি হোক আর পৈতৃক জমি হোক যখন তার ওপর কৃষকের হাত পড়েছে—তখন সে হাত সরান যাবে না। বাবার কথা শুনে পাগল হয়ে যান অবিনাশবাবু। তিনি স্বচ্ছন্দে বলে যান। বাবা নাকি আমাকে আপনার কাছে ঠেলে দিয়ে—এই আন্দোলন করাচ্ছেন। বিরাট লাভের ব্যাপার আছে এর মধ্যে। বাবা যা বলছেন—আপনি নাকি তাই করছেন। বাবা আপনাকে নাচাচ্ছেন। আমার সম্পর্কে কুৎসিত ইঙ্গিত বাবার আর আমার কাছে কতখানি মর্মান্তিক তা আপনি নিশ্চয় উপলব্ধি করছেন। তিন দিন তিনি একরকম উপবাস করে ছিলেন। শেষ

পর্যন্ত ঠিক করেন—আমাকে দিদির কাছে জব্বলপুরে পাঠিয়ে দেবেন। এ ছাড়া তার কাছে আর কোন পথ খোলা ছিল না। বাড়ি এসে অবিনাশবাবু বারবার বিশ্রী ধরনের কদর্য ইঙ্গিত করে গেছেন আর শাসিয়েছেন—গালিগালাজ দিয়েছেন নোংরা-ভাষায়। আমি আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি দিয়ে দেখলাম আমার অগ্রগতি অব্যাহত রেখে বাবার সম্মান বজায় রাখতে গেলে—এ ছাড়া আমার আর কোন পথ নেই।

স্বার্থত্যাগের বিষয়টা আপনার থেকেই হৃদয়ঙ্গম করি। আজ একটি জ্যোতিষ্কের গতিপথের বাধা দূর করতে এটা আমার অবশ্য করণীয়। আমি আজ থেকে সাধারণের দলে মিশে যাচ্ছি। আমার প্রিয় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আপন-পথে পরিক্রমা করুক। আমি দূর থেকে তা দেখতে চাই। এতেই আমার শান্তি। আমার আনন্দ।

আমার চোখের সামনে ভাসছে একটি চলমান-চিত্র। পা-বোঝাই ধুলো। ময়লা-বেমানান-জামাখানা ফুঁড়ে একজোড়া বলিষ্ঠ চোখ—কঠিন শপথমাখা মুখখানার মধ্যে সেঁটে আছে। এই মূর্তিখানা চিরদিন আমার কাছে এক বিশেষ মর্যাদা পাবে। একদিন অসংখ মানুষের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সমর্থ হবেন আপনি।

চরম দুঃখের দিনে শরে শরে ক্ষতবিক্ষত আপনার অঙ্গ দেখে যখন কেউ অন্তরের হীরকখণ্ডটি আবিষ্কার করতে পারবে না—সেই মুহূর্তে প্রথম দর্শনেই আপনাকে চিনে নোবো আমি।

চিঠিখানা পড়ে অন্যমনস্ক হয়ে যায় শতদ্রু। আজো দেখল লক্ষ্মী জনার্দনের মন্দিরের সামনে এসে কৃষকেরা বিভিন্ন কায়দায় প্রণাম করে গেল। এটা তাদের বিশ্বাস। সহজে এটা লোপাট হতে পারে না। ভাবনার রাজ্যে যুক্তির সিঁড়ি ভেঙে হাঁটার মানসিকতা যদি তৈরি হয়—তবে একদিন সত্যসন্ধান সম্পর্কে সজাগ সচেতন হবে—অন্য পথে হাঁটবে। তখন সাহসীর সংখ্যা বাড়বে অন্ধকার ভরা এই দেশে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষগুলোর পাশে থেকে—তাদের দৃষ্টিটা স্বচ্ছ করে দিতে হবে। এর জন্যে তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকের যেমন প্রয়োজন—তেমনি প্রয়োজন কিছু দরদী মূল-ধারণাসম্পন্ন পায়ে-হাঁটা লোকের। আজকে সেই ধরণের 'পায়ে-হাঁটা' কিছু মানুষকে কাছে চাইছে সে। পাশে চাইছে।

সুস্মিতা সেখানে এসে দাঁড়াতে পারবে না কোনদিন। ইংরেজ আমলের আদর্শবাদী সংগ্রামী তার বাবা পর্যন্ত আজ ভীত সন্ত্রস্ত। মেয়ের জীবনে পাছে ধাক্কা লাগে তাই সরিয়ে দিচ্ছেন তাকে। পিতা তাঁর কন্যার কল্যাণ কামনা করুন। কদিন তাদের পাশে থেকে অনেক পাওয়া গেছে। শ্রদ্ধার সঙ্গে তা গ্রহণ করেছে শতদ্রু। তার বেশি কিছু চায় না সে।

মা ডাকেন। তাড়াতাড়ি ঘুমোতে বলেন। শতদ্রু ধীরে ধীরে তার ছোট্ট ঘরখানার দিকে হাঁটে। কখন ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল সে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম আসে না। মাধবীলতার গন্ধ ভেসে আসছে খোলা জানালা দিয়ে। আকাশ বোঝাই তারা। প্রতিটি আলোকপিণ্ড তার অনেক দিনের চেনা। জানালা দিয়ে সব কিছু দেখা যায়। দেখতে দেখতে কখন তন্দ্রা আসে। মেঘের গর্জন শুনে ভেঙে যায় পাতলা ঘুমটা। জানালা দিয়ে অজস্র বাতাস ঢুকে আসে। বর্ষা নামে। বিদ্যুতের আলোয় সব কিছু স্পষ্ট। জানালা দিয়ে তাকায় শতদ্রু। লাঠি হাতে কয়েকজন এগিয়ে আসছে। জানালা বন্ধ করে দেয় সে।

॥ ৯ ॥

আজ অনেক দিন পর মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙে। সকালের সূর্যের আলো পবিত্র পরিবেশ তৈরি করে। 'শত ওঠ বাবা—বেলা হয়ে গেল।' মায়ের প্রসন্ন-মুখ তার জীবনে এক সম্পদ। অনেক দিন থেকে হিসাব কষে দেখেছে উৎসে এ জিনিস না থাকলে এগিয়ে যাওয়া যায় না। জানালা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ নাকে আসে। প্রাণ ভরে এর স্বাদ গ্রহণ করে শতদ্রু। কাঁচিরামদা বলে, মাটির গন্ধে কৃষকেরা পাগল হয়ে যায়। মরশুমের সময় কৃষককে আটকে রাখলে সে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করে। রোদ্দুরের রঙটা আজ কেমন? চাঁপাফুলী না কমলা রঙের? হাসপাতালে থাকতে সূর্য ওঠার সময় সে রঙ সম্পর্কে চিন্তা করতো। ভাবতো এটা তো কেউ করে না। সূর্য ওঠার পর থেকে আলোর রঙ কিন্তু একই ধরনের থাকে না।

জ্ঞানদাময়ী হাসেন। শতদ্রুর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, আর ব্যথা নেই দাদা? ওষুধ কি এখনো খেয়ে যেতে হবে?

শতদ্রু ঠাকুরমার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলে, এখনো কিছু দিন

খেতে হবে। তোমার হাত এত ঠাণ্ডা কেন ?

গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ভাই। তাছাড়া সকালে টুকিটাকি কাজ করেছি। হাতে জল লেগেছে তো।

গতরাত্রিতে বাজপেয়ীদের ছোট ছেলে এসেছে কলকাতা থেকে। একটু পরে আসবে এ বাড়িতে। জ্ঞানদাময়ী খবরটা দেন। তার বলার মধ্যে কেমন একটা বিস্ময়ের ভাব লুকিয়ে থাকে।

সাত সকালে খবরটা দিল কে তোমাকে ?

ও বাড়ির সরকারবাবু এসেছিল।

শতদ্রুর সকালের চিন্তাটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। বাজপেয়ীদের আশ্রয়ে তারা আছে। আছে বললে ভুল হবে। খেয়ে-পরে বেঁচে আছে। বাজপেয়ীরা তাদের অন্নদাতা আশ্রয়দাতা। এর আগে প্রয়োজনে এখানের বাড়িতে বা কলকাতায় যাবার তলব দিয়েছেন তারা। আজ বাড়িতে আসছেন। ব্যাপার কি ?

কিছুক্ষণের মধ্যে বাজপেয়ীদের ছোট ছেলে অতনু ঘরে ঢোকে। জ্ঞানদাময়ীকে প্রণাম করে।

বাপরে ! অনেক বড় হয়ে গেছ তুমি। কত ছোট দেখিচি।

সবই আপনাদের আশীর্বাদ।

সেদিন পর্যন্ত নদীর ধারে ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের তলায় ছোটাছুটি করে খেলাধুলা করে গেছ অতনু।

হাঁ ঠাকুরমা। কলকাতায় থাকি কিন্তু এই ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছের নীচের মাঠটার কথা আজো মনে পড়ে ! পরক্ষণে শতদ্রুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, শত আমরা কত দিন এক সঙ্গে খেলেছি বল ?

শতদ্রু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, কাবাডি খেলার তুই বাগিয়ে ধরতিস আমায়। বলতিস আমরা ‘কনৌজ’ বামুন। তোদের মত ‘রাঢ়ীদের’ বগলে পুরে রাখতে পারি। কথার শেষে হো হো করে হেসে ওঠে দু’জনে। জ্ঞানদাময়ী আর সর্বাণী দুই বাল্যবন্ধুর স্মৃতিচারণা উপভোগ করেন। সকালে দুই বন্ধুকে কি খাবার দেবে তাও শাশুড়ী-বৌয়ে যুক্তি করে। কোন দিন তো ওরা আসে না এ বাড়িতে।

বাবার চাপে এলুম। এসে বিরাট লাভ হলো।

কী লাভ হলো ?

বলবো না। মুখ টিপে হাসে অতনু।

শতদ্রু গম্ভীর হয়ে যায়। অতনুর চোখে নিজের দৃষ্টি যতদূর সম্ভব শান্তভাবে নিক্ষেপ করে বলে, বাবার চাপটা কী ভাই?

আমাদের পয়লা নম্বরের শত্রু অবিনাশ ঘোষাল একদিন হঠাৎ বাড়ি গিয়ে হাজির। বাবা রীতিমত ঘাবড়ে যান ওকে দেখে। ঐশ্বর্যগড়ে থাকতে যার সঙ্গে কোন দিন এতটুকু সদ্ভাব ছিল না। শত্রুতা করেছেন প্রতিটি কাজে। তিনি হঠাৎ হাজির। কোন ভূমিকা না করেই তিনি আরম্ভ করলেন, দিনে দিনে হলো কি? গ্রামের মানুষের যাহোক দু'মুঠো জুটছে জাগ্রত দেবতা লক্ষ্মীজনার্দনের কল্যাণে। কিন্তু মন্দিরের পূজারীর কাজের ত্রুটি দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। রাজেশ্বর তর্করত্ন পণ্ডিত লোক। কিন্তু তার ছেলে যবনদের সঙ্গে নির্বিবাদে ঘোরাফেরা করে। এক সঙ্গে খায়। দিনরাত হৈচৈ করে। বাবা জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু এতে রাজেশ্বর তর্করত্নের দোষ কী?

বাড়িতে ছেলেকে পাত্তা দিচ্ছে কেন? একপাল লোক দিন রাত বাড়িতে বসে থাকে। শলাপরামর্শ করে। জাতধর্ম মানে না। আমাদের সর্বনাশ করে। কম্যুনিস্টদের সঙ্গে মেশে। ওদের জাত ধর্ম আছে নাকি? মন্দিরের লাগোয়া বাড়িতে বসে বিধর্মীদের মত এই সমস্ত অনাচার করবে ওরা? বলেন অবিনাশবাবু।

বাবা বলেন, এতেও তো পণ্ডিতমশায় সম্পর্কে কিছু বলা যায় না।

যাহোক ওকে সরাতে হবে। নাড়ার-গোড়ায় রস থাকলে উপড়ে আনা শক্ত। ওকে শায়েস্তা করতে হবে। ভাতে মারতে হবে। শেষে বলেন, তোমাদের জায়গা জমি ও ছোঁড়া নিজের নামে রেকর্ড করাবে। কালসাপ!

বাবা হাড়ে হাড়ে চেনেন ভদ্রলোককে। রাগের বড় কারণটা কি তা তিনি জানেন। নিজের স্বার্থে আঘাত লাগলে ভদ্রলোক পাগল হয়ে যান। ভদ্রলোক কথা আদায়ের আগে মুখে-হাতে জল দিতে পর্যন্ত রাজী হন না।

বাবা খুব শক্ত হয়ে বসে থাকেন।

অবিনাশবাবু শেষ পর্যন্ত বলেন, ব্যাপারটা তো আমার ব্যক্তিগত নয়। সারা এলাকার কল্যাণ এর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এই ব্যাপারটা আপনি তলিয়ে বুঝবেন না? আমি আপনার বাড়িতে এসে—

বাবা বলেন, আপনি অনেক দূর থেকে এসেছেন। আগে আমার যা করার আছে করতে দিন। তার পর কথা।

শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে ফিরে আসেন অবিনাশবাবু। আসার সময় বার বার বলেন, আপনি কাজটা ভাল করলেন না। এর ফল আপনাকে পেতে হবে।

বাবা এই সমস্ত কথা তোমাকে শুনিয়ে যেতে বলেছেন। কথাবার্তা এর বেশি এগোয় না। শতদ্রু এর মধ্যেকার নির্যাসটুকু পেয়ে যায়। কি বলতে এসেছে তাও বুঝে ফেলে।

বহুদিন পর অতনুকে সঙ্গে নিয়ে শতদ্রু ভাগীরথীর বিস্তৃত চরে এসে দাঁড়ায়। শতদ্রু বলে, বিকালে এখানে এসে খেলতে না পারলে মনের কি অবস্থা হতো মনে আছে ?

এসব কথা কেউ ভুলতে পারে !

ছট-পুজোর দিন কি সুন্দর লাগত অতনু ?

নিশ্চয়। তোমার চোখ খুব ধারাল—তাই এর ভেতরকার অনেক কিছু দেখতে পেতে তুমি।

তা ঠিক নয়। আমি ভাবি যারা এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে চিন্তা করেছিলেন তাদের মধ্যে কতখানি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। কতখানি সত্যানুসন্ধানী ছিলেন তাঁরা ? পৃথিবী সূর্যতনয়া। এর উদ্ভিদজগৎ জীবজগৎ বায়ুস্তর সবই সূর্যের দান। তাই সূর্যকে সামনে রেখে কোন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যখন প্রণাম জানায় তখন আমরা মুগ্ধ হই। অন্তত এই ক্ষেত্রে তার ধর্মানুরাগ যুক্তিনির্ভর।

অতনু বলে, কাঁদি-কাঁদি কলা ঝুড়ি-ঝুড়ি আপেল লেবু ফল নিয়ে নদীর ঘাটে ধর্মপ্রাণ বক্তিরা জগতের প্রাণশক্তি সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে। গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো হয়। কি অদ্ভুত ব্যাপার।

সূর্যের অবদান আমাদের দেহে মনে। প্রতিদিন পৃথিবীর রূপ পাল্টাচ্ছে। তিলে তিলে তিলোত্তমা হয়ে উঠছেন মা বসুন্ধরা।

ডাঙায়-লাগা জেলে ডিঙির ওপর বসে দুই বন্ধু পুরাতন দিনের স্মৃতি রোমন্থন করে। নীচে ভাগীরথীর উন্মুক্ত স্রোত ছুটে চলে। মাঝে মাঝে ঢেউ ছুটে আসে—আছড়ে পড়ে সুবিস্তৃত চরে।

শতদ্রু শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের বান ডাকার প্রসঙ্গ ওঠালে একরকম লাফিয়ে ওঠে অতনু। বলে, বাপরে বাপ ! এক জীবন্ত প্রলয়ঙ্কর-সৌন্দর্য। জীবনে যারা এ জিনিস দেখেনি প্রাণের-উন্মত্ত-গতিবেগ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই।

নৌকোগ‍ুলো ভাসতে ভাসতে ছ‍ুটে চলে। কত বাঁধা নৌকোর কাছি কেটে যায়। উল্টে যায় কত নৌকো। পারের-মাঝি সময়ক্ষণ মেপে বিচক্ষণতার সঙ্গে আদেশের ভঙ্গিতে বলে, এখন পাড়ি বন্ধ। বান ডেকে যাক্‌। তারপর লোক ওঠাব। এর পর গলার স্বর অস্বাভাবিক নীচু করে অতন‍ু বলে, মাঝি তো বানের শেষে নৌকায় লোক ওঠায়। কিন্তু তুমি কি করবে ভাই?

আমি?

হাঁ। তুমি। তোমার নৌকোয় ওঠার জন্যে একদিকে স‍ুস্মিতা অন্যদিকে সবিতা দাঁড়িয়ে আছে শ‍ুন্‌ল‍ুম। কাকে ওঠাবে নৌকোয়?

শতদ্র‍ুর ম‍ুখ রক্তিম হয়ে ওঠে। দ্র‍ুত সে ভাব কাটিয়ে ধীরে ধীরে বলে সে, প‍ৃথিবীতে একটা মৌলিক নীতি আছে। তা মেনে চলতে হয় সবাইকে। প্রশ্নটা করে তুমি ভালই করছে। এখানে শ‍ুধ‍ু আমার জবাব নয়—আমার অন্তরের-স্বীকারোক্তি অন্তত একজন শ‍ুনে থাক। স‍ুস্মিতা আমার সামনে আসে ঝোড়ো হাওয়ার মত। সমাজে মার-খাওয়া অবহেলিত আশ্রয়হীন আমরা। তাই স্বাভাবিক কারণেই একটা ব‍ৃত্ত এঁকে নিতে হয় আমাদের। সে ব‍ৃত্ত আজো আঁকা আছে। তার বাইরে গিয়ে কোন কাজ করা বা কথা বলা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। জীবনটা একটা অঙ্কের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তো। গোঁজামিল দিলে ভুল হয়ে যাবে সব। ফলাফল ঠিক জায়গায় এসে দাঁড়াবে না। স‍ুস্মিতা যে পরিবেশে জন্মেছে—তা আমার কাছে সম্প‍ূর্ণ অপরিচিত। প্রাণচঞ্চল মেয়েটি খ‍ুব ভাল। কিন্তু তাকে জীবন-নৌকোয় ওঠানোর কথা আমি ভাবতেই পারি না। জীবনের আর এক সন্ধিক্ষণে এসে দেখলাম সবিতাকে। অপরিচিতা কোন-মহিলা প‍ুর‍ুষের কাছাকাছি এসে এমন ঘনিষ্ঠভাবে মেলা-মেশা করতে পারে এর আগে আমার তা জানা ছিল না। সেবা-যত্ন দায়িত্ববোধ তাছাড়া প্রাণের প্রাবল্যে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে সে। এ ছাড়া সে অতি মাত্রায় সমাজ-সচেতন। আমারই মত মার-খাওয়া পরিবেশে তার জন্ম। এদের দ‍ুজনকেই আমার ভাল লেগেছে। তার মানে কিন্তু এই নয় যে বানের-শেষে কাউকে নৌকোয় তুলতে হবে। নৌকোয় কাউকে তুলতে হলে শ‍ুধ‍ু ভাল লাগার ব্যাপারটাই থাকে না। আরো কিছ‍ু যোগ হবে ভাই। যেটা যোগ হবে তা উভয় পক্ষের কিছ‍ু চিন্তা ভাবনার একত্রিকরণ। ব্যাপারটা খ‍ুব কঠিন। সময় সাপেক্ষ। যাহোক এ সব কথা তোমার কানে চলে গেছে! আশ্চর্য দ‍ুনিয়া! হো হো করে হাসতে থাকে শতদ্র‍ু।

যাই হোক—পৃথিবীতে কোন কথাই গোপন থাকে না ভাই। একদিন না একদিন তার আবরণ খসে পড়বেই।

কলকাতা থেকে একটা বাণিজ্য জাহাজ আলোড়ন সৃষ্টি করে সদর্পে ভেসে যায়। কয়েকখানা নৌকো জাহাজ ঢেউয়ের দোলনায় দুলতে থাকে। একপাল চিল জাহাজের পিছু পিছু উড়ে চলে। মাঝে মাঝে নেমে-আসে আন্দোলিত জলের ওপর। সাদা মাছ পায়ে আঁকড়ে উড়ে যায়। উদ্দেশ্য-বিহীনভাবে আকাশের সাদা মেঘের টুক্‌রো ভেসে বেড়ায়। অতনুর মুখের দিকে দৃষ্টি এনে কিছু বলতে চায় শতদ্রু। বলতে পারে না। অতনু হাসে।

একটার পর একটা ঢেউ সামনে আছড়ে পড়ে। শতদ্রু বলে, তোর কবিতা লেখার বাতিক ছিল—সেটা আছে তো?

কাগজ কলম নিয়ে বসি।

ওতেই হবে।

অতনু ঢোক গিলে বলে, আমার যে জন্যে আসা তা কিন্তু স্পষ্ট করে এখনো বলা হয়নি। বাবা পাঠিয়েছেন তোদের থাকার ঘরের অবস্থাটা একটু দেখে যেতে। মিস্ত্রী লাগিয়ে পরিষ্কার করে দেবার কথাও বলেছেন। আরো একটা কথা বলেছেন—পণ্ডিতমশাইয়ের যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহলে লাহিড়ী-বাগানে তোদের জন্যে একটা বাড়ি করে দিতে চান তিনি। এবছর ভাল লাভ হয়েছে আমাদের ব্যবসায়। তাই বাবার মনটা খুব ভাল। আরো একটা কথা বলে পাঠিয়েছেন—আমাদের যতটুকু জমি-জমা আছে তা ঠিক মত রেকর্ড করিয়ে দিস। সরকারমশাই তোর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

বন্ধুত্বের যে স্বাভাবিক গতিটা এতক্ষণ পুণ্যস্রোতা ভাগীরথীর মতই প্রবাহিত হচ্ছিল তা হোঁচট খায়। অতনুর প্রস্তাবের মধ্যে সমস্ত বিষয়টা জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায়। অবিনাশ ঘোষাল নিশ্চয় আশঙ্কার একটা বীভৎস চিত্র তুলে ধরেছেন অতনুর বাবার কাছে।

শতদ্রু বিষয়টি বুঝে নিয়ে বলে, অতনু—বাবার মুখে আমি শুনেছি গ্রামের ঘরবাড়ি ছেড়ে আমাদের চলে আসতে হয় কতগুলো অসৎ স্বার্থপর মানুষের জন্যে। সে সময় তোমার ঠাকুরদাদা আমাদের আশ্রয় দেন। শুধু আশ্রয় নয়—দু'বেলা দু'মুঠো খাবার ব্যবস্থাও করে দেন। আজো আমার মা-ঠাকুরমা শ্রদ্ধার সঙ্গে সে কথা স্মরণ করেন। আমি নিজেও মনে করি—দুর্দিনে যিনি আশ্রয় দিয়েছেন তিনি আমাদের পরম বন্ধু। এর বেশি কিছু বলার নেই

আমার। শতদ্রুর চোখ ছলছল করে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে দু'চোখ মুছে সে বলে, বাবাকে বলিস আমার হাতে এতটুকু ক্ষতি হবে না তাঁর।

পৃথিবীতে যে যা করে—সবই তার চরিত্র অনুযায়ী ভাই।

অতনু হঠাৎ শতদ্রুর হাতদুটো শক্ত করে ধরে। খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাছে টেনে এনে বলে, বাবা যে প্রস্তাব দিয়েছেন তাতে তুই মত দে ভাই। অন্যভাবে নিস না জিনিসটা। এটা দয়ার দান নয়। দীর্ঘদিন অনুমতি দিয়ে সে অনুমতি খারিজ করা যায় না। আমার বাবা সেটা ভালই বোঝেন। তাছাড়া তার আন্তরিক ইচ্ছা এটা।

তোমার বাবার আন্তরিকতায় আমি খুশি কিন্তু আমার বাবাকেও তো কথাটা বলতে হবে। বাড়িতে যাঁরা আছেন তাঁদেরও একটা মতামত আছে।

ভাগীরথীর স্রোতের দিকে তাকিয়ে শতদ্রু ভাবে। যারা জীবনে কিছু পেল আনন্দময় মুহূর্তে তারা দুহাত তুলে নমস্কার জানাল। যারা পেল না তারা এই খরস্রোতের পাশ দিয়ে শুধুই হেঁটে গেল। একবার তাকাল না পর্যন্ত এই জীবন্ত-স্রোতের দিকে। তারা দেখল শুধু একটা জলপ্রবাহ। অথচ অন্যের চোখে এই নদীর গতিপথ এক বিশেষ ছন্দ-বিশেষ—জীবনাদর্শের ছবি নিয়ে উপস্থিত। শতদ্রু আজ দু'হাত তুলে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানায় ভাগীরথীর স্রোতধারাকে।

॥ ১০ ॥

মাঠ জরিপের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। সারাটা দিন মাঠে টো টো করে ঘুরে চাষীদের নাম লেখাতে হয়। আপত্তি দাখিল করতে হয়। শতদ্রুর খুব অসুবিধা হয় যেখানে চাষীরা নিজের জমির দাগ নম্বরটা পর্যন্ত জানে না। খতিয়ান নম্বর তো দূরের কথা। ভবানীবাবুর দুঁদে গোমস্তা বিনোদ সরকার একগাদা খাজনার দাখিলা এনে দাগ নম্বর ধরে ধরে বলেন, এই জমি তো ভবানীবাবু প্রদীপ বাঁড়ুজ্যেকে দিয়েছেন। দাখিলা মূলে বন্দোবস্ত এই দেখুন চেকমুড়ি। এটা অবনী বাঁড়ুজ্যেকে দিয়েছেন। এটা শশাঙ্ক বাঁড়ুজ্যেকে দিয়েছেন। সব দাখিলা মূলে বন্দোবস্ত।

শতদ্রু সরব হয়ে ওঠে। প্রদীপবাবু অবনীবাবু শশাঙ্কবাবু সবাই ভবানীবাবুর ছেলে। জমিগুলো অন্যায়ভাবে কুক্ষিগত করার জন্যে তিনি চেকমুড়ি কেটেছেন।

না।

তাহলে আপনি দেখান ভবানীবাবু এই জমি কোথা থেকে পেয়েছেন ?

রীতিমত ঘাবড়ে যায় বিনোদ সরকার।

শতদ্রু বলে, দেখান কি আছে আপনার কাছে ?

কচিরাম পণ্ডু হারান গুলে নিতাই চেঁচামেচি করতে থাকে। আসল চাষীদের কলা দেখিয়ে ছেলেমেয়েদের নামে জমি ?

কানুনগো তুখড় লোক। চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন, জেলা জরিপের রেকর্ড দেখা হবে। মাঠে সত্যিকারের কে চাষ করে দেখা হবে। কিভাবে চাষী এলো দেখা হবে। তবে তো ধরা যাবে ব্যাপারটা। এর মানেটা শতদ্রু ভালভাবে জানে। মাঠ জরিপে যদি চাষীরা নিজের নাম রেকর্ড করতে না পারে তাহলে সাত-হাত জলে গিয়ে পড়বে। এ্যাটেস্টেশান বা তার পরবর্তী ধারাগুলোতে সুবিধা করতে পারবে না। তাছাড়া জমির মালিকরা একটার পর একটা দেওয়ানী মামলা করবে। ফৌজদারী মামলাও করবে ডজন ডজন। কোর্টে মুন্সেফ জজসাহেব কাগজপত্র না পেলে—শুধু সাক্ষী দিয়ে সুবিধা হবে না। তাই গোড়া-বেঁধে কাজ করতে হবে। 'ঠিকে' 'গুলো' বা 'ভাগচাষীদের' মাঠ-জরিপে নামটা লেখাতেই হবে। লিখতে যদি না চায় সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি দাখিল করতে হবে। জমিতে দখল রাখতে হবে।

দল বেঁধে কচিরাম পণ্ডুদের নিয়ে কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যায় শতদ্রু। সে বেশ বুঝতে পারে পিছনে টাকার-খেলা চলছে। কোন কোন জায়গায় কানুনগো ভবানীবাবুর ছেলেমেয়েদের নাম লিখছে। শতদ্রু চাষীদের নাম লেখার জন্য পেড়াপেড়ি করলে নানা ধরনের অজুহাত সৃষ্টি করছে। প্রতিটি জায়গায় 'অবজেকশান' দিয়ে যাচ্ছে শতদ্রু। এ ব্যাপারে কাগজ লিখে সাহায্য করছে সবিতা! তার কাঁধের ব্যাগে কয়েক দিস্তা কাগজ কার্বন-পেপার। তাছাড়া মা খাবার তৈরি করে দেন। চাপ দিয়ে সময়মত শতদ্রুকে খাওয়াতে হয়। সময়মত খাবার ব্যাপারে শতদ্রুর ভীষণ অবহেলা। কাজে ডুবে গেলে সবকিছু ভুলে যায়। বেজায় কাজপাগল মানুষ। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সর্বাণী সবিতাকে বলেছেন, সত্যি মা এমন বেয়াড়া ছেলে খুব কম দেখা যায়। ছেলেবেলা থেকে ওকে খাওয়াতে সাত-পাড়ার লোক জানাজানি হতো। দু'পা দু'হাত সাপটে ধরে তবে দুধ খাওয়াতে হতো। কথার শেষে সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ে।

আকাশে খটখটে রোদ্দুর। সারা পৃথিবী পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। গাছ-পালার পাতা রীতিমত ঝলসে গেছে। মাঠের ঘাসের রঙে হলুদের ছোপ লেগেছে। ভাগীরথীর তীরে ঐশ্বর্যগড় মৌজায় পুরোদমে মাঠ-জরিপের কাজ চলেছে। গামছা ছাতা মাথায় দিয়ে অজস্র মানুষের মেলা বসেছে বেন। এক একটি জমিতে এক এক ধরনের যুক্তি এনে কথা বলছে জমির মালিকরা। নিজেদের কথা প্রতিষ্ঠিত করতে মিথ্যা সাক্ষী আনা হয়েছে। এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানে যুঝে যাচ্ছে শতদ্রুর দলবলরা।

পঞ্চু মোড়ল ৬৭২ দাগের জমি দেখিয়ে বলে, এই জমিটা আমি চাষ করি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিনোদ সরকার বলে ওঠে, না না। এ জমি চাষ করে রণজিৎ ব্যানার্জী।

আমি লাঙ্গল করে দিই হুজুর। টাকা দেন রণজিৎবাবু। কোর্টে মিথ্যে সাক্ষী দেওয়া অভ্যাস আছে। তাই হুজুর কথাটা বেরিয়ে আসে কেষ্টর মুখে।

একজন সাক্ষীর কথা শেষ হয়ে যাবার পর আর একজন বলে, আমি রোয়ার কাজ করি। রণজিৎবাবু মুড়ি-বিড়ি-টাকা দেন।

পঞ্চু মোড়ল মাথায় কয়েকবার টোকা মেরে বলে, টাকা রণজিৎবাবু দেবেন কেন? আমি দিই। বছরে একশো পঁচাত্তর টাকা। জমির জন্যে অগ্রিম জমা।

কানুনগো বলেন, তোমার মোট জমি কতটা?

আজ্ঞে পাঁচ বিঘের মত।

৬৭২ দাগ ছাড়া আর কোন কোন দাগে তোমার জমি আছে?

৩২১ ৩২৭ দাগে জমি আছে।

জমি দেখাতে পারবে।

নিশ্চয়। তাছাড়া আরো একটা জিনিস দেখাতে পারবো।

কি?

বিনোদবাবু এই সমস্ত জমির টাকা চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। সে চিঠি আমার কাছে আছে।

কানুনগোবাবু আড় চোখে তাকান বিনোদবাবুর দিকে। বিনোদবাবু এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেনে চোখ নামিয়ে নেন। কানুনগোবাবু চিঠিখানা দেখে নিয়ে ফেরৎ দেন পঞ্চুকে। পঞ্চু কাগজখানা ভাঁজ করে বিড়ির কৌটোর মধ্যে রাখে। কৌটোটা রাখে ফতুয়ার পকেটে।

নদীর বাঁধের ওপর বট গাছের তলায় দুপুরে বসে শতদ্রু। কচিরাম পঞ্চুর দলও বসে যায়। দুপুরে গামছায় বাঁধা মুড়ি ছিবুতে থাকে সবাই। সবিতা ঝোলা ব্যাগ থেকে কলাপাতায় মোড়া রুটি তরকারী বার করে। দুজনে পাশাপাশি বসে তাড়াতাড়ি খেয়ে নেয়। কচিরাম পঞ্চুকে বলে ভারি চমৎকার মিল দুজনের।

পঞ্চু বলে, কাজও করতে পারে।

ধুলো উড়িয়ে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ায় গাছের তলায়। একজন বৃদ্ধ বয়সের আর দুজন যুবক নামে গাড়ি থেকে। এদিক ওদিক তাকায় তারা। বৃদ্ধ ভদ্রলোক পঞ্চুর কাছে এসে বলেন, কানুনগো সাহেব কোথায়?

পঞ্চু বিশ্রামরত কানুনগোকে দেখিয়ে দেয়।

বৃদ্ধ আর যুবক দু'জন এগিয়ে যায় কানুনগোর দিকে। কিছুক্ষণ কথা-বার্তা বলে। ব্যাগ থেকে কাগজপত্র খুলে দেখাদেখি হয়। শেষে সবাই ফিরে আসে পঞ্চুর কাছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলেন, তোমরা এখানকার প্রজা হিসেবে নাম লেখাতে এসেছো?

হাঁ হুজুর।

জমিটা কার?

ভবানী বাঁড়ুজ্যের থেকে বন্দোবস্ত নিয়ে চাষ করি।

জমিটা ভবানীবাবুর নয় তা কী জান তোমরা?

তা কেমন কেরে জানব বাবু।

কচিরাম বলে, আপনি বলুন না জমিটা কার?

জমিটা সত্যরাম বোসের। তিনি বিলেতে গিয়ে মারা যান। তাঁর দুই নাতি শচীপতি আর ভূপতি রায়কে এই জমি দিয়ে গেছেন। এরাই সেই দুই নাতি শচীপতি আর ভূপতি রায়। এরাই জমির মালিক।

শচীপতি ভূপতি দুজনে হাত জোড় করে নমস্কার করে। কৃষকদের একটা ছোটখাট ভিড় জমে যায় তিনজনকে ঘিরে।

পঞ্চু শতদ্রুকে ডেকে আনে। বলে, যা বলার একে বলুন। ইনি আমাদের হয়ে কথা বলবেন।

শতদ্রুকে হাত তুলে নমস্কার করেন গিরিজাবাবু। বলেন, এনড্রুল কোম্পানীর এটর্নী সত্যরাম বোস জমিটা কেনেন। মরার সময় তিনি উইল

করে দিয়ে গেছেন এই জমি। তার একমাত্র কন্যার দুই ছেলেকে। অর্থাৎ আমার দুই ছেলেকে। কলকাতা থেকে গ্রামে এসে জমি দেখাশোনা করার অসুবিধে। তাই আমাদের খুবই পরিচিত ভবানী বাঁড়ুজ্যে মশাইকে দেখা-শোনা করতে দিই। ভবানীবাবু আমার সঙ্গে কলকাতায় পড়তেন, সেই সূত্রে আলাপ। ওর ওপর বিশ্বাসও ছিল যথেষ্ট।

শতদ্রু জিজ্ঞাসা করে, এখন কি অবস্থা?

গিরিজাবাবু বলেন, এখন ভবানীবাবু বলছেন এ জমিটা তার। তিনি আমাদের খাজনা দেন। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। যাহোক এখন তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের নামে পুরো জমিটাই খাজনা-মূলে প্রজাবিলি করে দিয়েছেন। ছেলেমেয়েরা নাকি হাল-লাঙ্গল কিনে 'মজুর চাষী' দিয়ে চাষ করায়। এক গুণ্ডা দলের সর্দার নাকি দলবল নিয়ে তাদের সরিয়ে দিয়ে জমি নিজেদের লোকজনের নামে রেকর্ড করাতে চায়?

উপস্থিত সবাই মুখ চাওয়াচায়ি করতে থাকে। শতদ্রু ধীরে ধীরে বলে, জমির ব্যাপারটা খুব জটিল জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে দেখছি। আপনি আপনাদের জমির ব্যাপারে আদৌ মাথা ঘামাননি। বন্ধু ভবানীবাবুকে দেখা-শোনার দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি নিজের ইচ্ছা মত দায়িত্ব পালন করছেন। ভবানীবাবু যাদের জমি বন্দোবস্ত দিয়েছেন—সেই সমস্ত চাষীদের উৎখাত করতে চাইছেন এই জরিপের সময়।

জমি তো খাসে আছে।

না। এই সমস্ত প্রজারা বহুবছর টাকা দিয়ে জমি চাষ করে। এদের নামে যাতে জমি রেকর্ড হয় সেই চেষ্টা চলছে। আমাকেই গুণ্ডা দলের সর্দার বলা হয়েছে। যেহেতু আমি এদের সাহায্য করি।

ভবানীবাবু বলেছেন, জমি খাসে রেখেছেন তিনি। বলেন গিরিজাবাবু।

ওসব মিথ্যে কথা। শতদ্রু সব কথা খুলে বলার পর আকাশ থেকে পড়েন গিরিজাবাবু। বলেন, আমাকে আগে বছরে হাজার খানেক টাকা দিত। এখন বলে হেজে-মজে যায়। ভাল ধান হয় না। তাই টাকাও দেয় না।

দূরে থাকেন তো—তাই জানেন না। পলি পড়া এখানকার জমিকে বলে ধানের-রাজা জমি। বর্ষায় বৃষ্টি না হলে নদীর জলে চাষ হয়ে যায়। বেশি বৃষ্টি হলে নদীতে জলনিকেশ হয়। আপনার বন্ধু আপনাকে বানান গল্প বলে এসেছেন এতদিন। এই জমি থেকে ভবানীবাবু অনেক টাকা ওঠান।

আপনাকে এক হাজার টাকাও দেন না ?

কাঁচরাম বলে, আপনাকে দিলে তার কলকাতার বাড়ি হবে কি করে ? এখানকার রমরমা সংসার চলবে কি ভাবে।

শচীপতি ভূপতি শতদ্রুকে ডাকে। একটু দূরে গিয়ে বলে, কি করেন আপনি ?

এ বছর আই এ পরীক্ষা দিয়েছি।

পড়াশোনা করতে করতে এই সব— ?

আমাদের মত মানুষের জীবনে নির্দিষ্ট সময় ধরে—নির্দিষ্ট কোন কাজ হয় না। পড়াশোনা করতে করতে গ্রামের ছেলেরা হাল লাঙ্গল করে। চাষাবাদ করে। দোকান চালায়। কি করবে ?

স্ট্রাগল করেই শতদ্রুবাবু জীবনে উঠছেন। বলে শচীপতি।

এখানে স্ট্রাগলটা রীতিমত মাটি ছোঁয়া। যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সত্যিই বিদ্যা অভ্যাসের মত কাজে সামাল দেওয়া যায় না।

কাঁচরাম পণ্ডুরা রীতিমত আলোচনা চালিয়ে যায় গিরিজাবাবুর সঙ্গে। সবিতা চোখ খোলা রেখে উপস্থিত। এখন রীতিমত কাজকর্মে রপ্ত হয়ে গেছে সে। চাষীদের স্বার্থবিরোধী কোন কথা হলেই সে ক্যাঁক করে ওঠে। কিংবা মস্তিষ্কে গচ্ছিত রাখে আলোচনার বিষয়গুলো। একসময় শতদ্রুকে জিজ্ঞাসা করে গিরিজাবাবু—শচীপতি ভূপতির সঙ্গে কোন মীমাংসা করা যায় কিনা ?

হাঁ। পথ তো খোলাই আছে। আপনাদের নামে জমি, আপনারা চাষীদের প্রজা বলে স্বীকার করে নিন। যত টাকা অগ্রিম জমা দেয় সেটা খাজনা হয়ে যাক।

এখন খাজনা তো আমরা পাব না। বলেন গিরিজাবাবু।

শতদ্রু বলে, সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের টাকাটা তো পাবেন। মোটা অঙ্কেই পাবেন সেটা। না হলে সেটাও তো পাবেন না।

গিরিজাবাবু বলেন, হাঁ সেটা তো প্রাপ্য হয় বটেই। কিন্তু আমরা তো জমি প্রজা-বিলি করিনি। তাই জমিটা তো খাস।

শতদ্রু সহাস্যে বলে, আপনি এই কথাটা অনেকবার বলেছেন। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়।

পণ্ডু মোড়ল মাথায় কয়েকটা টোকা মেরে চোখ নাচিয়ে বলে, ছোট মুখে

বড় কথা হয়ে যায় বাবু। মনে কিছু করবেন না। বয়েস কালের মেয়ে যদি চোখের বাইরে থাকে—কিছুদিন পরে যদি বাচ্চা-কাচ্চা কোলে নিয়ে আসে তখন সেই বাচ্চা-কাচ্চাগুলোকে নাতি-নাতনি বলতে হবে যে। ফসল-ফলা জমি আর বয়েস-কালের-মেয়ে দুইই তো সমান বাবু।

সবিতা মাথা নীচু করে। গিরিজাবাবু বিষন্ন মুখেই বলেন, তোমাদের সঙ্গে একবার দেখা করা উচিৎ তাই এলুম। তোমাদের কথাও শুনলুম। ভাবনা চিন্তা করি। তোমরাও ভাব। আমার বাড়ির ঠিকানা রাখ। একটা কথা মনে রেখ বিনা রসিদ-কাগজে প্রজা হতে পারবে না তোমারা। আইন যতই তোমাদের পক্ষে যাক। আইনের মারপ্যাঁচের সামনে দাঁড়াতে পারবে না তোমরা।

আপনি দেখুন বাবু—তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কাঁচিরাম গিরিজাবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলে, আপনার আশীর্বাদ থাকলে ঠিক পারবো বাবু।

সঙ্গে সঙ্গে চাষীরা লাইন দিয়ে প্রণাম করতে থাকে। পাঁচু রাজভর শরীর ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে বলে, আপকি কিরপা পরভু।

ধীরে পদক্ষেপে তিনজনে গাড়িতে ওঠে। গিরিজাবাবুর মনটা হঠাৎ যেন কেমন হয়ে যায়। অবিনাশ ঘোষাল তার কাছেও গিয়েছিল। অনেক কথা বলে এসেছিল। শতদ্রু গুণ্ডা দলের সর্দার—এটাও তার কথা। কিন্তু শতদ্রুকে দেখার পর তার মনোভাব পাল্টে যায়। গিরিজাবাবু আইনের লোক। তার দুই ছেলেও আইন ব্যবসায় করে। তিনি শতদ্রুর কাছে আইন বহির্ভূত কোন কথা শোনেননি এখনও পর্যন্ত। তাছাড়া নম্র বিনয়ী চাষীরা কোন উগ্র ব্যবহার করেনি। তাই হিসাবে তার গোলমাল হয়ে যায়।

ঐশ্বর্যগড় থানার কাছে এসে গাড়ি থামান গিরিজাবাবু। অবিনাশবাবু ছোটখাট একটা দল নিয়ে উপস্থিত সেখানে। গিরিজাবাবু নামার সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসি হাসতে হাসতে বলেন অবিনাশবাবু, কী বাবু হয়েছে তো?

কী হয়েছে?

কথার প্যাঁচ জানে ছোকরা। কথার মার দেওয়া ছাড়া—গায়ে হাত দিয়েছে নাকি। এখন তো অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে থাকে তার লোকজন।

দূর হয়ে যান আমার সামনে থেকে। মিথ্যে কথা বলেছেন আমায়। আমার জমি পারি রাখবো। রাখতে না পারি যাবে। আপনাকে সাহায্য করতে হবে না। আপনি ভবানীবাবুকে সাহায্য করতে যান।

অবিনাশ ঘোষালের মুখ দিয়ে কথা বার হয় না। থরথর করে কাঁপতে থাকেন তিনি।

গিরিজাবাবু বলেন, জমি আমাদের। আইন মাফিক তার একটা ফয়সালা করতে হবে। ছোকরা খুব স্পষ্ট ভাষায় সেকথা বলেছে। কোন খারাপ কথা বলেনি তো। খারাপ ব্যবহার করবেই বা কেন ?

আপনার অনেক আছে বাবু। তাই দু' দশ লাখের লোকসানে আপনার গায়ে লাগবে না। আমার বুঝতে ভুল হয়েছিল। অবিনশবাবু কাঁদ কাঁদ হয়ে কথাগুলো বলেন।

অবিনাশবাবু আপনার কথা একবর্ণও সত্য নয়। আপনি বলেছিলেন মদ তাড়ি খাইয়ে একদল লোক এনে প্রজা সাজাচ্ছে শতদ্রু। কথাটা আদৌ সত্য নয়। যারা ওখানে আছে কেউ এই ধরনের লোক নয়।

মিষ্টি কথা বলে শয়তানটা আপনার মন ভুলিয়ে দিয়েছে।

না অবিনাশবাবু—আপনি আবার উল্টোপাল্টা বকছেন। আপনার সাহায্যের দরকার হবে না আমার। ড্রাইভার গাড়িতে ষ্টার্ট দেয়। উঠে বসে তিনজন। হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন অবিনাশবাবু।

গিরিজাবাবু যাবার পথে ছেলেদের সঙ্গে পরামর্শ করে নেন, মীমাংসা যদি করতেই হয় তবে চাষীদের সঙ্গে করে নেওয়া হবে। তখন কমপেনসেসানটা ভালই পাওয়া যাবে। শতদ্রু এ ব্যাপারে ভাল প্রস্তাব দিয়েছে।

ভবানী বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে পরামর্শ করেই অবিনাশ ঘোষাল গিরিজাবাবুর কাছে গিয়েছিলেন। ওদের এখানে আসার দিনও ঠিক হয়েছিল। কিছু লোকজনের ব্যবস্থাও হয়েছিল। মাঠে শতদ্রু পণ্ডুদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় অবিনাশবাবুর লোকজন গিরিজাবাবু বা তার ছেলেদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই আক্রমণটা চালিয়ে দেওয়া হবে শতদ্রুর নামে। মাঠ থেকে ফেরার পথে অবিনাশবাবু গিরিজাবাবুকে দিয়ে একটা মামলা করাবেন। এটাই ঠিক ছিল। কিন্তু সব ভেস্তে গেল।

গিরিজাবাবুর সঙ্গে কথাবার্তার সময় কচিরাম পণ্ডুরা সুন্দর ভাবে ঘিরে রেখেছিল আশপাশ। তাই অবিনাশবাবুর লোকেরা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যায়। শতদ্রুর এই দূরদৃষ্টির জন্য সবিতা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। কচিরাম বলে, মার খেয়ে দাদুন আমার খুম পাকা হয়ে গেছে। হুঁশিয়ার, শতদ্রু আজ-কাল আটঘাট বেঁধে কাজ করে।

॥ ১০ ॥

ঐশ্বর্যগড় গ্রামখানার নামকরণের সম্পর্কে একটা ভাবনা ক'দিন শতদ্রুর মাথায় এসে উপস্থিত হয়েছে। নগর বা গ্রাম পত্তনকারীরা সাধারণত নিজের নাম জাহির করার ব্যাপারটা বেছে নেয়। এখানকার সামন্ত-প্রভুরা নিশ্চয় এই গ্রামের নামকরণের মূলে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত তারা সমানে ঐশ্বর্য-সৃষ্টি করছে এখানকার মাটি থেকে। মাত্র কয়েকজনের স্বার্থের ধারাবাহিকতার ইতিহাস আজ পর্যন্ত সমানে চলে আসছে। খেটে-খাওয়া মানুষদের স্বার্থে এর ধারাকে ভিন্নপথে প্রবাহিত করা প্রয়োজন।

মাঠ-জরিপের পর কয়েকটা দিন একটু কাজের ফাঁক ছিল। গ্রামখানা তন্ন তন্ন করে ঘুরেছে শতদ্রু। একটা বড় সভা হবে চটকলের মাঠে। শ্রমিকদের সভা। কৃষকরাও যাবে। এক হয়ে লড়াই করতে না পারলে লাভ নেই। ইতি-মধ্যে বঙ্কিম মুখার্জী সুধীন পালের সঙ্গে ঘন ঘন দেখা হচ্ছে শতদ্রুর। শুধু চাষীগুলোর কথা তাই সে আজ ভাবে না। ভাবছে এই এলাকার শ্রমিক-কৃষক সবার কথা।

ঐশ্বর্যগড় মৌজার অনেকখানি জমি নিয়ে চটকল তৈরি হয়েছে। কিন্তু চটকলের অবস্থান আজ আর ঐশ্বর্যগড়ে নয়। কোম্পানীর নাম অনুসারে জায়গাটার নাম হয়েছে 'সাহুনগর'। সাহুনগরের শ্রমিকদের ওপর হাজার রকমের অত্যাচার চলেছে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা যাবে না। সাহুনগরে আছে সাহু-কোম্পানীর দারোয়ান। এরা কোম্পানীর স্বার্থে মারপিট খুন-জখম সবকিছুই করতে ওস্তাদ। জমিদার-ঠিকেদারদের দারোয়ান-গুলোও সমান দাপটে পথ হাঁটে। নায়েব-গোমস্তার দল বুক ফুলিয়ে কাজ করে যায়।

ঐশ্বর্যগড় থানার বড়বাবুর সামনের-সারির চেয়ার এদের জন্যে সংরক্ষিত। দিনরাত শলাপরামর্শ করে এইসব দণ্ডমুণ্ডের কর্তাবাবুরা। গরীব মানুষরা হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় হয় না বড়বাবুর।

শতদ্রুর সঙ্গে সবিতাও হাঁটে ছায়ার মত। এলাকার গরীব মানুষ দু'জনের

এই সহজ সম্পর্কে খুবই আনন্দিত। দু'জনে জরিপের জন্যে আপত্তির-ফর্ম লেখে। অনেক জায়গায় মাঠ জরিপে গণ্ডগোল হয়েছে। সেখানে আপত্তি দিতেই হবে। ধার্য দিনে উপস্থিত হতেই হবে সাক্ষী-সাবুদ নিয়ে। রীতিমত শুনানী হবে বিষয়টির। শতদ্রুরা যথাসময়ে সেখানে গিয়ে হাজির হয়।

কৃষকদের নিয়ে সভা করা দরকার। দরকার শ্রমিকদের নিয়ে সভা করার। আজকাল শতদ্রুর উভয় স্থানেই ডাক পড়ে। আজ জুটমিলের পাশের ময়দানে সভা। শতদ্রু কথা বলে সুধীন পালের সঙ্গে। সভা বিকাল ৫টায়। গ্রাম থেকে কৃষকেরা আসবে আগেভাগে। ভোঁ বাজার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকরাও আসবে এখানে। মিলমালিক একদল গুণ্ডা দিয়ে সমানে শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। তপেশ্বর মাহাতো সাদাকাশ পুলিন দাশ মার খেয়েছে। তার মধ্যে পুলিন দাশ পাল্টা মার দিয়ে সিফ্‌ট ইনচার্জের দাঁত ফেলে দিয়েছে। এর পরেও মার খেয়ে বিক্রম সিং তেজু রাজভর লালন সিং পুলিন দাশ আর তেজু আসে শতদ্রুর কাছে। কি করা যায়? শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছে—অন্যান্য সাংগঠনিক কাজের সঙ্গে একটা সভাও হবে। সেই সভার দিন আজ। মালিকের ঠাঙাড়ে-বাহিনী আর পুলিশও নামবে। ক'দিন গ্রামের লাগোয়া বস্তিতে বস্তিতে সভা হয়েছে। গ্রামে সভা হয়েছে। এখানে গরীবদের কোন শক্তি মার খেয়ে গেলে অন্য শক্তিও মার খেয়ে যাবে। তাই খুব তৎপরতার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যায় শতদ্রু।

বিকাল থেকে ঝাণ্ডা হাতে অশ্বত্থতলায় পঞ্চু কচিরাম পাঁচুরাজভর দাঁড়িয়ে আছে। একবার ডাকাডাকি হয়ে গেছে। আসছে সবাই এক এক করে। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী না গড়লে কোন লাভ হবে না। শতদ্রু সবাইকে এটা বোঝাতে পেরেছে।

মিছিল চলে। সমুদ্রের গর্জন ওঠে। জুটমিলের পাশের মাঠে ঝাণ্ডা পোঁতা হয়ে যায় চক্ষের নিমেষে। মাইক্রোফোন আসে। তাড়াতাড়ি লাগান হয়ে যায়। ভোঁ বাজে। বেরিয়ে আসে শ্রমিকের-স্রোত। আজ পাশ-কাটিয়ে যাবার ইচ্ছা কারো নেই। তিলধারণের ঠাঁই থাকে না মাঠে। শতদ্রু সবিতা কচিরাম পঞ্চুর দল তদারক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

শতদ্রু আজ শ্রমিক সভায় বক্তব্য রাখবে। সবাই তাকায় তার দিকে। খাপখোলা তলোয়ারের মত চেহারা। বক্তব্যে ক্ষুরধার। শ্রমিকদের ওপর মালিকের অত্যাচারের অধ্যায় দিয়ে সভা শুরু হয়। শেষ হয় শ্রমিকদের ওপর

অত্যাচার চালালে—ম্যানেজমেণ্ট এই দ্বীপে বসে সুবিধা করতে পারবে না, এই ধরনের হুঁশিয়ারী দিয়ে। গ্রামের মানুষ অবরোধ করবে তার গুণ্ডা-বাহিনীকে। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত সবাই আনন্দে ফেটে-পড়ে। থানার বড়বাবু সিকিউরিটি অফিসারের টিন থেকে দামী সিগারেট নিয়ে বলে, ছোঁড়া এলাকাটাকে জ্বালাবে দেখছি।

সিকিউরিটি অফিসার বলে, হুঁ।

খেটে-খাওয়া-ঘামঝরা শ্রমিকের নেতৃত্বে সমস্ত শোষণ অত্যাচার বন্ধ হবেই। কৃষকেরা সব সময় ঘামঝরা শ্রমিকের পাশে আছে। থাকবেই। সবিতার বুকে আজ উথালপাথাল সমুদ্রের ঢেউ। দু'চোখের তারার উজ্জ্বল নক্ষত্র। কচিরাম পণ্ডুর গায়ে ঢলে-পড়ে। বলে, আমার দাদুনের কথার বাঁধুনী দেখ। পাথরের চাঁই ছুঁড়ে মারছে।

পাঁচু রাজভর হাততালি দিয়ে নাচে। বুক চাপড়ে বলে, সাব্বাস জোয়ান। খুন মে আগ লাগা দিয়া।

বঙ্কিম মুখার্জী তার বক্তব্যে এক নতুন দিগন্তের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। বলেন, কৃষকরা যেমন শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তেমনি শ্রমিকেরা গিয়ে দাঁড়াবে কৃষকদের পাশে। চাষের সময় তারা দাঁড়াবে দল-বেঁধে আলের ধারে। ধান কাটার সময় গিয়ে দাঁড়াবে। মাঠ জরিপের সময় বন্ধুর মত শ্রমিকেরা যাবে কৃষকদের পাশে। সমস্ত সভা এই বক্তব্যে নৃত্য করতে থাকে যেন।

সভার শেষে কচিরাম গুলে নিতাই হারান পণ্ডুদের নিয়ে করমআলীর ঘরের মধ্যে বসেন বঙ্কিমবাবু।

শতদ্রু বলে, মাঠ-জরিপে অধিকাংশ খতিয়ানে ভবানীবাবুর ছেলেমেয়েদের নাম লেখা হয়েছে। এ্যাটেস্টশন অফিসারও সেই নাম বহাল রেখেছেন। জমির চারপাশের দখলীকার—আশপাশের লোকজনদের সাক্ষীসাবুদ দিয়েও কিছু হচ্ছে না। পরচার ১৩ কলমে ওদের নাম লেখা হচ্ছে। ২৩ কলমেও।

বঙ্কিমবাবু বলেন, অবস্থাটা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে—বাইরে প্রচার আন্দোলন যেমন চলছে ওটা চালিয়ে যেতে হবে। হটে এলে ফল খারাপ হয়ে যাবে। আমি আজ প্রভাস রায়কে আসতে বলেছি। এখানের জমি-জমার ব্যাপারে ওকে সঙ্গে রাখা দরকার। তোমাদের ব্যাপারটা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রীকে জানাবো। তোমাদের সমস্যার কথা বিস্তারিতভাবে লিখে দিতে হবে। কোন খতিয়ানে কোন চাষীর নাম হওয়া উচিৎ। কতদিন সে চাষ করছে। বছরে

কত টাকা জমা দেয়। শেষে লিখতে হবে চাষীর দখল থাকা সত্ত্বেও অন্যায়ভাবে কার নাম লেখা হয়েছে। যার নাম লেখা হয়েছে তিনি ভবানীবাবুর কে হন?

কথার শেষে প্রভাস রায় এসে পেঁছান। শতদ্রু সবিতা কালিদাস বেরা ভালভাবে টুকে নেয় কি কি করতে হবে।

আবার শুরু হয়ে যায় কাজকর্ম। রাত দিন। দিস্তা দিস্তা কাগজে প্রত্যেক চাষীর আর বসবাসকারী প্রজার নাম ইত্যাদি লেখা হতে থাকে। বার বার কাগজগুলো পরীক্ষা করে দেখে শতদ্রু। প্রতিদিন মেলা বসে যায় লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দিরের সামনের বাঁধান-চত্বরে।

'জাহাজ-ভর্তি কাগজ পাঠিয়ে শতদ্রু এবার কিস্তিমাৎ করবে। রীতিমত আমাদের কাঁপুনি শুরু হয়েছে রে বাবা।' ভবানীবাবুর মহল থেকে চাপা হাসির আওয়াজ ভেসে আসে।

তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে হটিয়ে দিলেও আসলে ব্যাপারটা কি—হদিস করতে পারে না ভবানীবাবু। লোক পাঠায় সব কিছু জানতে। ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝে নিয়ে নাক সিট্‌কোয়। বলে, কত হাতি-ঘোড়া গেল তল, ভেড়া কয় কত জল—? অবাক করলে মানুকে! তবু মাঝে মাঝে খবর নেয়, কি হচ্ছে?

হবে। হবে—। কাজ ঠিক হবে।

কবে?

দেখ্‌বেন! অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে পেঁচেছে ওরা।

বেঁচে যখন আছি, দেখে যাবো বৈকি!

ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রীর দপ্তরে প্রতিবাদ জানানোর পর তিনি তাঁর দপ্তরকে জিনিসটা খুঁতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেন। একজন উচ্চপদস্থ অফিসারকে বিষয়টি দেখার কথা বলা হয়। বেহালা সি ক্যাম্পের সার্কেল ইনেসপেক্টর এই কাজের ভার পান। শতদ্রু যোগাযোগ করে সার্কেল ইনেসপেক্টর মিঃ কুন্ডুর সঙ্গে। সবকিছু শুনে মধ্যবয়সী ভদ্রলোক মিঃ কুন্ডু বলেন, এ জায়গায় টিকে থাকতে পারবে তো ছোকরা? জায়গাটা খুবই পিচ্ছিল। যে কোন মুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পার!

শতদ্রু স্মিত হেসে বলে, এই রাস্তায় হাঁটার ব্যাপারটা মোটামুটি রপ্ত করে ফেলেছি। এটা অবশ্য অহঙ্কার নয়, আত্মবিশ্বাস।

এ কাজে আত্মবিশ্বাসের খুবই প্রয়োজন। তবু বলছি সতর্ক থাকবে।

শতদ্রু মাথা হেঁট করে সম্মতি জানায়।

শতদ্রু মিঃ কুণ্ডুকে কেমন যেন আকর্ষণ করে। মিঃ কুণ্ডু খোলা মনে সে কথা বলে ফেলেন—কচিরামদের বাদামতলায় চৌকিতে বসে। শতদ্রু তার স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সঙ্গে বলে, এটা আপনার মহত্ব। বারবার মাথা নাড়তে নাড়তে মিঃ কুণ্ডু বলেন, না না এটা মহত্বের-বিরাটত্বের ব্যাপার নয় শতদ্রু। সুন্দর-ফুল তার নিজ-গুণে মনকে আকৃষ্ট করে। সবার এই আকর্ষণ করার ক্ষমতা নেই। আমি দীর্ঘদিন মানুষের জীবনের এক জটিল দিক নিয়ে পড়ে আছি। অনেককে দেখেছি। মানুষ চিনতে আমার খুব একটা ভুল হয় না।

মাঠে মাঠে প্রতি দরখাস্তের ওপর তদন্ত শুরু করেন মিঃ কুণ্ডু। শতদ্রু বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে থাকে মিঃ কুণ্ডুর মুখের দিকে। বেশ জোরের সঙ্গেই বলেন তিনি, ভবানীবাবুর চেকমুড়ি-কেটে ছেলেমেয়েদের জমি-বিলি করার মানে বুঝি না। চেকমুড়ি দেখিয়ে আর যাকে ভোলান—আমাকে ভোলাতে পারবেন না। চাষী জমি দেখাচ্ছে। পাশ-আটনের হেলো-মজুরের সাক্ষী দিচ্ছে। দু'এক খানা চিঠি দেখাচ্ছে। যে চিঠিতে ভবানীবাবু টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন। এর পর সব জিনিস জলের মত পরিষ্কার।

অবিনাশ ঘোষাল চোখ পাকিয়ে বলেন, লোকটা ডাহা কম্যুনিস্ট—

সত্যি কথা বললে আপনি যদি কমিউনিস্ট বলেন, তাহলে—

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানাব। দেশছাড়া করবো তোমাকে।

করবেন।

কাজ এগিয়ে চলে।

সমস্ত মৌজা তদন্ত করার পর মিঃ কুণ্ডু সুপারিশ করেন এবার সাক্ষী নিয়ে, কাগজপত্র দেখে—এ্যাটেস্টশন করতে হবে। ওপরমহল রাজী হয় এতে। খুশির আবহাওয়া সৃষ্টি হয় কৃষকদের মনে। মিছিল-সভা-বৈঠক আরম্ভ হয় পুরোদমে। কৃষক কর্মীদের নিয়ে বারবার বসতে থাকে শতদ্রু। মাঝে মাঝে ছুটে যায় কলকাতা। কেণ্ডারডাইন লেনে। ধর্মতলা স্ট্রীটে বঙ্কিম মুখার্জীর কাছে।

ভবানীবাবু প্রথমে একটু দমে গেলেও তাড়াতাড়ি দুর্বল ভাবটা কাটিয়ে নেন। একটা কৌশল ঠিক করে ফেলেন। হাবা-গোবা গাঁয়ের চাষীদের বেকায়দায় ফেলার জন্যে। মীরজাফর খুঁজে বার করেন। তাদের লোভ দেখান, যা জমি চাষ করিস তার ডবল জমি দোবো—শুধু বলতে হবে ফি-বছর তোরা

জমি চাষ করিসনি। মাঝে মাঝে অন্য চাষীরাও ঐ জমিতে চাষ করেছে। কথাটা কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে ওঠে শতদ্রু। প্রতিবছর জমি চাষ করে—এই ধারাবাহিকতা দেখাতে না পারলে শত্রুপক্ষ, চাষীদের ঘায়েল করে দেবে। তখনই পাখি-পড়ান শুরু হয়ে যায় পাড়ায়-পাড়ায়। অতি গোপনে। কেউ যেন এ-কথা আদৌ না বলে, মাঝে মাঝে একজনের চাষ করা জমি অন্য-জনে চাষ করেছে। ঘটনাটা অবশ্য সত্যও নয়।

বেশ ঘটা করেই দ্বিতীয়-বারের এ্যাটেস্টশন কাজ শুরু হয়। সেদিন শহর থেকে কয়েকজন বাঘা-বাঘা উকিল আসে এ্যাটেস্টশন ক্যাম্পে। সঙ্গে আনে মোটা মোটা আইনের বই। এমন একটা অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিল না শতদ্রু। প্রথমে জাঁদরেল চেহারার উকিল আর চামড়ায় বাঁধান মোটা বই দেখে ভয় পেয়ে যায়। তার মুখের দিকে বারবার তাকায় সবিতা আর কালিদাস। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে ওঠে কবিগুরুর অমোঘবাণী, 'সংকটের কল্পনায় হয়ো না ম্রিয়মাণ'। বাঘের চোখের মত ঝলসে ওঠে শতদ্রুর দু'চোখ। সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন অবিনাশ ঘোষাল।

প্রথমে কচিরামের খতিয়ান শুরু হয়। কচিরাম তার চার পাশের জমির সাক্ষী ছাড়া কিছু মজুরের সাক্ষী দেয়। এদিকের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে উকিলবাবুও জেরা শুরু করেন। বলেন, ঐশ্বর্যগড়ের কোন জমিতে আপনি প্রজা নন।

কেন?

খাজনা দিয়ে আপনি জমি চাষ করেন না।

তবে কী দিয়ে আমি জমি চাষ করি?

টাকা-নিয়ে আপনি জমি চাষ করেন। তার মানে আপনি জনমজুর। জনমজুর দিয়ে জমির মালিক জমি চাষ করান।

ক্যাম্পের মাঠের সামনে সাহুনগরের শ্রমিকরা ছুটে এসেছে। চিৎকার করে বলছে, কচিরাম বেরা গুলে শেখ নিতাই আদক হারান পোল্লে পণ্ডু মোড়ল পাঁচু রাজভর জমিতে চাষ করে। পঁচিশ তিরিশ বছর। জমির আল দিয়ে আমরা মিলে যাতায়াত করি। আমরা জানি।

উকিলবাবু বলেন, দরজা বন্ধ করে দিন হুজুর। বাইরে গোলমাল হচ্ছে।

শতদ্রু বলে, গোলমাল নয় হুজুর—হাজার হাজার লোক এসেছে সাক্ষী দিতে।

সাক্ষী ?

হাঁ।

অবিনাশ ঘোষাল বলেন, এর নাম সাক্ষী ? জলজ্যান্ত গুণ্ডামী।

মধ্যস্বত্ব লোপের পর যেখানে মাটি-ছোঁয়া কৃষকেরা জমি পাবে, তাদের হাতে এই সাক্ষী ছাড়া আর কি প্রমাণের-জিনিস থাকতে পারে বলুন ? তাছাড়া জমির মূল-মালিককে বাদ দিয়ে যেখানে 'গেঁজ' বেরিয়ে চিৎকার করছে মালিক-দখলীকার হিসাবে—সেখানে দখল প্রমাণের জন্যে এছাড়া আর কী উপায় থাকতে পারে বলুন ?

আপনি কে ?

আমি এই চাষীদের জমির ব্যাপারে দেখাশোনা করি। শতদ্রু।

এমন সময় শচীপতি ভূপতি এসে ঢোকেন। শচীপতি বলেন, আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে হুজুর। হাইকোর্টে একটা ঝামেলা ছিল। সেটা সেরে আসতে হচ্ছে।

ভবানীবাবুর উকিল বলেন, আপনার পরিচয় ?

শচীপতি বলেন, বিরোধীয় সমস্ত জমির মালিক আমরা দুই ভাই। শচীপতি আর ভূপতি। জেলা জরিপের সময় আমাদের নামে সমস্ত জমি রেকর্ড হয়েছে। ভবানীবাবু বাবার বন্ধু স্থানীয়। তিনি সমস্ত জমি দেখাশোনা করতেন মাত্র। তিনি বরাবর বলে আসছেন জন-মজুর হাল-লাঙ্গল লাগিয়ে নিজ হেফাজতে জমি চাষ করে আসছেন।

এতক্ষণে এ্যাটেস্টশন অফিসার মুখ খোলেন। একটি মাত্র কথা বলেন—কিন্তু—

আসলে দেখা যাচ্ছে এখানকার কাণ্ডকারখানা। জমিতে প্রজা হিসাবে নাম লেখাবার জন্যে সবাই উঠে পড়ে লেগেছে। বলেন শচীপতি।

চাষীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জঙ্গল সাফ করে নোনা-জমিতে সোনা ফলাচ্ছে। জমির চেহারা পাল্টে দিয়েছে। তারা তো নতুন আইন মোতাবেক নিজের নিজের নাম লেখাবেই। বলে শতদ্রু।

এ্যাটেস্টশন অফিসার পুনরায় মুখ খোলেন। বলেন, এক পাল লোক এসে হৈচৈ করছে—এতে আমার কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমি কাজ বন্ধ করে দোবো।

শতদ্রু দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, আপনি কাজ বন্ধ করবেন কেন ? কাজ চালিয়ে

যান। ভবানীবাবুর লোকজনের কথা আপনি শুনুন। শচীপতি ভূপতি-বাবুদের কথা শুনুন। শেষে আমাদের কথা শুনুন। আমাদের প্রত্যেকটি লোক এসে আপনার কাছে সাক্ষী দিয়ে যাবে।

ঠিক এমন সময় মিঃ কুণ্ডু এসে উপস্থিত হন। এ্যাটেস্টশন অফিসার নিজের আসন ছেড়ে দেন মিঃ কুণ্ডুকে। মিঃ কুণ্ডু বলেন, কোন্ কোন্ পক্ষ আপনার সামনে উপস্থিত হয়েছেন?

ভবানীবাবু, শচীপতি-ভূপতিবাবু আর চাষীরা।

এদের সবার কথা লিখুন আপনি। এর-ওপর একটা হিয়ারিং তো হবে। বলেন মিঃ কুণ্ডু।

প্রজাদের সাক্ষীর সংখ্যা অনেক।

অনেকটা জমি। সাক্ষী-সংখ্যা বেশি তো হবেই।

ওরা কি আজেমোজে এন্তার সব জমির দখলীকার দেখিয়ে সাক্ষী দিয়ে যাবে?

না। এক জন চাষীর জমি ব্যাপারে চার-পাঁচ জন সাক্ষী দেবে। দৃঢ় সংযত কণ্ঠে কথাগুলি বলে শতদ্রু।

উপস্থিত উকিলবাবুরা আর শচীপতি ভূপতিবাবুরা চম্‌কে ওঠেন শতদ্রুর এই কথা শুনে।

অবিনাশ ঘোষাল কি সব বলেন—কেউ কান দেয় না তার কথায়।

শতদ্রু এদিন প্রতি চাষীর জন্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক সাক্ষী এনে উপস্থিত করায়।

উকিলবাবুরা প্রথম দিকে একটু চাপাচাপি করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

কচিরাম পঞ্চু হ্যাসাকের আলো এনে রেখে যায় অফিসের মাঝখানে। সবাই মুখ চাওয়া-চায়ি করতে আরম্ভ করে। মিঃ কুণ্ডু বলেন, ইঙ্গিত বুঝছেন না? নীরবে সাক্ষী দিয়ে যাচ্ছে। আলো এনে দিচ্ছে। এর মধ্যে দিয়ে জানাচ্ছে যতক্ষণ সম্ভব আপনারা কাজ চালিয়ে যান। কিছু পরে তিনি শচীপতি ভূপতিবাবু আর উকিলবাবুদের নিয়ে আলাদা ভাবে বলেন, আমি নিজে জমিতে ঘুরে ঘুরে দেখেছি। আশপাশের লোকজনদের জিজ্ঞাসা করেছি। সবার মুখে এক কথা—এরা জমি চাষ করে। তাই ভূমিসংস্কার আইনের মূল নীতিকে কাজে লাগাতেই হবে আমাদের।

এরপর উকিল বাবুরা চলে যান। চলে যান ভূপতিবাবু শচীপতি-

বাবুরাও। চাষীরা সাক্ষী উপস্থিত করে—জমির আশপাশ দিয়ে যারা বছরের পর বছর হেঁটে যায় সেই সমস্ত মানুষকে।

শতদ্রু ভাল ভাবেই বোঝে পেশির শক্তির জোরেই জমির ওপর আধিপত্য রক্ষা করা যায়। মিঃ কুণ্ডু ইঙ্গিত দিয়ে যান—প্রাথমিক শুনানী পর্বে জয় হলেও একে রক্ষা করতে বেগ পেতে হবে। এখনও অনেক ধাপ আছে—নতুন ধাপ তৈরি হবে মাঝে মধ্যে।

শতদ্রুর মনটা আজ রীতিমত উল্লসিত। মনে-প্রাণে এক মহান সত্যকে উপলব্ধি করে সে আজ। মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে নিরলস-অতন্দ্র-প্রচেষ্টা থাকা দরকার। এই ক্রমাগত প্রয়াস সার্থকতার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে সমর্থ হবেই। ঐশ্বর্যগড়ের অগ্রিম-জমার চাষীদের নাম বহু কষ্টে রেকর্ড করা শুরু হয় পরচার পাতায়।

মন্ত্রিসভায় না থাকলেও শক্ত-বিরোধী-পক্ষের যে একটা শক্তিশালী ভূমিকা থাকে—তা উপলব্ধি করে শতদ্রু। কিন্তু সবার আগে প্রয়োজন গণ-আন্দোলন। গণ-জাগরণ।

শ্রমিক-কৃষক-মৈত্রীর পবিত্র রাখী-বন্ধন হয়ে যায়। পরের দিন থেকে উৎসাহের জোয়ারে ভাসতে থাকে কারখানার শ্রমিক আর মঠের চাষীর দল।

ঐশ্বর্যগড় হাটের পাশে কাছারি বাড়ি। জমিদারী সেরস্তা। নায়েব গোমস্তাদের হুল্লোড় প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। দারোয়ানগুলো দেশে চলে যেতে চায়। নদীর ধারে বিড়ি টানতে টানতে পঞ্চু বলে, শালা যা হলো না—গা-মতন। আগে ভয়ে বুকটা কাঁপছিল। কি হয়। কি হয়। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ভূত পালিয়ে যাচ্ছে।

বিষ্টু অনেক দিন পরে এসে উত্তেজনায় রীতিমত ডগমগ করতে থাকে। বলে, কি কত্তে হবে শুদু বলে দও। তার পর কি করি দেখ।

সিরাজের চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে। কচিরাম বলে, না ভাই বাক্স ভিঙে আনার ব্যাপার নিং এখিনে। অল্প টাকা যোগাড় করবো। গায়ে গতরে খাটবো। এই ভাবে সংসার চালাবার নোক আমরা।

সিরাজ বলে, আমায় অপমান করছো তোমরা। যতই অপমান করো, আমি কিন্তু তোমাদের ছাড়ছি নি। অনেক মানুষ দেখে দেখে রীতিমত পরখ করে তবে তোমাদের পাশে এসে ঠাঁই নিইচি।

প্রমাণ হোক রাস্তা পাল্টেচো। জায়গা পাবে।

প্রমাণ দিয়েই ঢুকবো। এমনি না। সিরাজের চোখের তারা আরো চঞ্চল হয়ে ওঠে।

পরের দিন বিকালে কলকাতা চলে যায় শতদ্রু। আই. এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়ে গেছে। কেণ্ডারডাইন লেনের অফিসে রাত্রিতে থাকবে। পরীক্ষার ফল ভাল হওয়ায় সবিতার মা অনেক মিষ্টান্ন নিয়ে এসেছেন। মিষ্টি মুখ করেই শুভযাত্রা। সবিতা সর্বাণীর সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যায়। যাবার পথে মা বলেন, এবার কিন্তু পড়াশোনাটা কলকাতায় হবে। ভর্তির ব্যাপারটা ঠিক করে আসিস। ট্রেনে যাতায়াত করবি। সাইকেলে ট্রেন স্টেশন পর্যন্ত যাবি। সুধীনদা বার বার বলেছেন একথা।

শতদ্রু যেন রাজ্য জয় করতে বেরুচ্ছে। আগে এমন কোন দিন আসে না তার জীবনে। বাড়ির সবাই এসে এগিয়ে দিয়ে যাও!

কলকাতায় এসে অনেক কলেজ খুঁজে ভর্তি হয় স্টেশনের কাছাকাছি একটা কলেজে। যাতায়াতের সুবিধা। ব্যবস্থা সব পাকা করে রাত্রিতে ফিরে আসে শতদ্রু—কেণ্ডারডাইন লেনের অফিসে। বৌবাজার চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের সংযোগস্থলে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে শতদ্রু। এত গাড়ি। কোথায় যায় এরা? এত ব্যস্তসমস্ত। গ্রামে তো এতো ব্যস্ততা নেই। গ্রামের মানুষের সঙ্গে শহরের মানুষের এত অসম সম্পর্ক থাকলে দেশটা ভাল ভাবে চলবে কি করে? সমাজ শরীরে সর্বত্র একই ধরনের স্বাস্থ্যগুণ থাকা প্রয়োজন। নাহলে যেখানে গুণের অভাব—সেখানের পঙ্গু অবস্থা পুরো সমাজ-শরীরকে অকেজো করে দেবে।

মেঝেয় চাদর পেতে বিনা বালিশে শুয়ে পড়ে শতদ্রু। পাশাপাশি অনেকেই শুয়ে আছে। কচিরাম পণ্ডুদের আন্তরিকতার কথা চিন্তা করতে করতে ঘুম এসে যায়। সকালে ট্রামের শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। মুখ ধোবার জন্যে কলে আসে। তাড়াতাড়ি গিয়ে ধরতে হবে বঙ্কিম মুখার্জীকে। দেরি করলে দেখা হবে না।

সারাদিন কাজ সেরে বিকালে চুপচাপ বসে থাকে শতদ্রু। আজ দেখা হয় না—আগামীকাল বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরবে। পিছন দিক থেকে পরিচিত কণ্ঠে ডাক আসে, দাদুন।

কে? কচিরামদা? কি ব্যাপার?

সর্বনাশ হয়েছে!

কি ?

গতরাত্রিতে নগেন চাটুয্যের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। নগেন চাটুয্যে থানায় বলেছে ওই ডাকাতিতে তুমি ছিলে।

আকাশ থেকে পড়ে শতদ্রু।

পঞ্চু বলে যায়, রাত বারোটা নাগাদ দুম্-দুম্ বোমার আওয়াজ হয়। হৈ হৈ করে লোক ছুটে আসে। মন্দিরের কাছাকাছি চলে আসে একদল। তারা তোমার বাড়ি এসে ডাকাডাকি করে। মা বলেন বাড়ি নেই। সঙ্গে সঙ্গে তারা চিৎকার করতে থাকে, শতদ্রু ডাকাতি করেছে। বাড়ি নেই। শালা থাকবো কেন ? কাজ সেরে ভেগে পড়েছে।

সকালে বঙ্কিমবাবুর কাছে আসে শতদ্রু। সব বলে। তিনি সমস্ত কথ চুপচাপ শুনে যান। কয়েকটা টেলিফোন সেরে বার হয়ে পড়েন—শতদ্রু কচিরাম পঞ্চুদের নিয়ে। সোজা চলে আসেন ঐশ্বর্যগড় থানায়।

বড়বাবু রীতিমত হকচকিয়ে যান। থানায় বসে তখন অবিনাশবাবু কি সব আলোচনা করছিলেন। বঙ্কিমবাবুকে দেখে চুপ হয়ে যায় সবাই। তিনি ডাকাতি-মামলার কথা জানতে চান। বড়বাবু বলেন, নগেন চ্যাটার্জী নিজে অবশ্য কিছু বলেন নি। পাড়ার লোকজনের অনুমান এটা শতদ্রুর কাজ।

বঙ্কিমবাবু বলেন, পরপর দু'রাত্রি উনি আমার কাছে ছিলেন।

অবিনাশবাবু মাথা চুলকে বলেন, তাহলে তো আর কথাই নেই।

আমি নিজে লিখিত বিবৃতি দেবো—আপনি যদি বলেন।

না। দরকার হবে না। তবে ওকে সাবধানে থাকতে বলবেন।

কেন ?

বার বার ওর নাম আসছে তো।

হাঁ। সে অবশ্য একটা কথা। একদিন আমার নামও আসতো।

জবাব শুনে, রীতিমত গম্ভীর হয়ে যান দারোগাবাবু।

বিকালে এ্যাটেস্টশন ক্যাম্পের পেয়াদারা গোছা-গোছা নোটিশ নিয়ে পাড়ায় ঢোকে। চাষীদের রেকর্ডের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছে ভবানীবাবু। লিখেছে—তার খাস জমি, অন্যায় ভাবে রেকর্ড করিয়েছে চাষীরা। শচীপতি আর ভূপতিবাবুরাও ঠিক একই ধরণের আপত্তি জানিয়েছেন চাষীদের নামে।

ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে চাষীরা ছুটে আসে শতদ্রুর কাছে। লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দিরের সামনে ভাঙা বিশাল বারান্দা আজ লোকে লোকারণ্য। মেয়ে-পুরুষ ছুটে এসেছে—বাঁচার পথ কি হবে তা জানতে। অবিনাশবাবুর লোকজন সমানে প্রচার করে যাচ্ছে—শতদ্রুর ফাঁদে পা না-দিয়ে অবিনাশবাবুর কাছে এলে একটা ব্যবস্থা করে দেবেন তিনি।

ভাগীরথীর সবুজ দূর্বাভরা চত্বরে বসে ভাবে শতদ্রু, সময়টা খুবই খারাপ যাচ্ছে। খুব হিসাব করে পা ফেলতে হবে। এতটুকু এদিক ওদিক হলে আর উপায় নেই। পশ্চিমাকাশে সূর্য অস্ত যায়। আজ এই সৌন্দর্য তার মনে কোন দাগ কাটে না। খুব ভোরে ফিঙেরে-ডাক তার খুবই প্রিয়। ক'দিন তা মনের ওপর কোন প্রভাবই ফেলছে না। এই ভাবনার ছেদ পড়ে। পিছন থেকে মিষ্টি এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে ডাকে সবিতা, শত।

তুমি এখানে ?

আসতে নেই ? উৎসবে ব্যসনে রাজদ্বারে দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে সর্বত্র তো পাশে থাকার কথা।

অবশ্যই।

আজ আমি নেহাৎ দায়ে পড়েই এখানে এসেছি। আমার বাবা পর্যন্ত জমির একটা অংশ দিয়ে মীমাংসা করে নিতে চায়। এমন একটা মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অবিনাশবাবু পূবদিকের সমস্ত চাষীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝাচ্ছেন। এই মুহূর্তে আজকের সভায় তোমাকে খুব সংযত আর বলিষ্ঠ ভাবে আমাদের কথা পেশ করতে হবে। এতটুকু দুর্বলতা কোথাও যেন না থাকে। খুব সতর্ক হয়ে চলবে।

তুমি পাশে থাকলে আমার ভুল হবার সম্ভাবনা খুব কম।

সবিতা ধরাগলায় বলে, তোমার এই নেতৃত্ব বলিষ্ঠভাবে যেন উত্তীর্ণ হতে পারে।

দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে যায় শতদ্রু। রাতদিন চলে তার বোঝানোর পালা। বাওয়ালী ক্যাম্পে মামলা শুরু হয়ে যায়। দল বেঁধে চাষীদের নিয়ে হাঁটে শতদ্রু। কাজ চলে। মাঠ থেকে মেলা উঠে আসে এ্যাটেস্টেশান ক্যাম্পে। কাগজপত্র সাক্ষী নিয়ে কাজ চলে।

শচীপতি ভূপতির সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে যায় শতদ্রুর। কথাবার্তা হয়।

কলকাতা গিয়ে শেষ কথা হবে। সবিতা সেদিন বলে শতদ্রুকে—তুমি দিন-রাত আমাকে এত-করে কাজ-কর্ম বোঝাচ্ছ কেন ?

ওরা আর বেশি দিন দেরি করবে না। আমাকে নেবেই। এমন অবস্থায় তুমি কাজ চালিয়ে যেতে পারবে তো ? বলে শতদ্রু।

এতদিন পাশে-পাশে থেকে কি বুঝলুম তাহলে ? অবস্থাটা আমি অনেক আগে থেকেই অনুমান করতে পেরেছি। কচিরাম পণ্ডুকে নিয়ে আলাদা কথা হয়। ওরা এখন ইস্পাতের ছুরির মত শানিত। অনেকদিন পরে একটু হেসে বলে শতদ্রু, ওরা ভেবেছে—আমি ছাড়া গতি নেই। এসব মোটা মাথার বুদ্ধি। যাহোক যে কোন সময় এ অবস্থা ঘটে যাবে। তোমরা প্রস্তুত থাকো।

বাড়িতে জ্ঞানদাময়ী সর্বাণী বিষয়টা অনুমান করে। শতদ্রুর গম্ভীর ভাব তাদের আদৌ ভাল লাগে না।

কলকাতায় আলোচনা হয় শচীপতিবাবু আর ভূপতিবাবুর সঙ্গে। কাগজ-পত্রে ওরা জমির আসল মালিক। ওরা প্রজাদের স্বীকার করে নেবেন যদি শতকরা পঁচিশ ভাগ জমি পান। কৃষক সভার অনেক দায়িত্বশীল নেতা বসেন। তাঁরা দেখেন এটা খুব খারাপ প্রস্তাব নয়। জমি খাসে ছাড়ার পরিমাণটা আরো একটু কমিয়ে কথাবার্তা চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে চলে আসতে থাকে। ভবানীবাবুরা আদালতে মামলা দায়ের করেন।

অবিনাশবাবু মাথা চুলকোতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত রাজেশ্বর পণ্ডিতের ব্যাটা এমন একটা ফয়সালা করে দেবে ? গাঁয়ে আমরা কেউ নয় ? সব শতদ্রু ! ওর শিকড় পর্যন্ত টেনে তুলে দিতে হবে।

ভবানীবাবু বলেন, করবেন কি করে ? তার পক্ষে আছে লোকজন আর আপনি হলেন ঢাল-নেই তলোয়ার-নেই নিধিরাম সর্দার। ভাড়াটে লোকজন নিয়ে আর কদিন চলবে এ কাজ ?

দেখছি—দেখছি। ফাঁদ কেটে-কেটে ফুড়ুত-ফুড়ুত করে উড়ে যায় ব্যাটা। এবার কি করে পালায় দেখবো।

সারা পশ্চিমবাংলায় রাজনৈতিক আন্দোলন চরম সীমায় পৌঁছেচে। গণ-আন্দোলনের নেতারা খুব সন্তর্পণে কাজ করছেন আপন আপন এলাকায়। আন্দোলনের ঝাঁজ অতীব তীব্র। সুধীন পাল হাসতে হাসতে বলে শতদ্রুকে —এবার তো বেশ কিছুদিন ছাড়াছাড়ি হতে হবে।

যা অনিবার্য তাকে রোধ করবে কে ? শতদ্রু বলে যায় কথাগুলো। যা

আর ঠাকুরমার কাছে কথাগুলো পাড়ে সন্ধ্যায় খাবার সময়। ওদের মানসিক অবস্থাটা ঠিক করে দিতে না পারলে কষ্টটা সহ্য করতে অসুবিধা হবে। বিশেষ করে ঠাকুরমায়ের পক্ষে।

জ্ঞানদাময়ী শতদ্রুর কথা শুনে বলেন, এতগুলো মানুষের একটা কিনারা করতে পারবি জেনে আমার বুক আনন্দে ভরে যাচ্ছে। যাদের আঘাত দিয়ে এটা করতে যাচ্ছিস—তারা তোকে পুজো করবে ভাই? সেকথা আমি বৌমাকে অনেক আগেই বলিচি। স্বাধীনতা আন্দোলনের পরের ধাপের এই আন্দোলন এত ছোট আর ঠুনকো নয়। যা। এগিয়ে যা।

সেদিন রাত দুপুরে পুলিশ রাজেশ্বর তর্করত্নের বাড়ি ঘিরে ফেলে। মা কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁকে প্রণাম করে হাসি মুখে বেরিয়ে পড়ে শতদ্রু। এত তাড়াতাড়ি যে ব্যাপারটা ঘটে যাবে সে ভেবে উঠতে পারেনি। জেলে সোনারপুরের এক বন্ধু জয়ন্ত বলে, বড় পুঁজিপতি সামন্ত প্রভু আর তার দালালদের বিরুদ্ধে এত লড়াই হবে আর তারা চুপচাপ বসে থাকবে এটা কি হয় ভাই? প্রিভেনটিভ ডিটেনশান এ্যাক্টে জেলখানা ভর্তি করে ফেলছে সরকার। ওরা জানে ক'জন নেতাকে ধরে রাখলে কাজ সারা হয়ে যাবে। এরা কিন্তু খুব বোকা।

জেলে দেখা করতে আসে সর্বাণী সবিতা। গোয়েন্দা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে—কাজের কথা বলতে ভুল হয় না সবিতার।

সবিতা বলে, এখন পঞ্চু কাঁচিরাম ছাড়াও অনেকে ইস্পাতের মত শক্ত হয়ে-গেছে। সে ঠিকমত যোগাযোগ রেখে যাচ্ছে সবার সঙ্গে।

সর্বাণীর মুখে হাসি। অনেক ছেলের মাকেই তিনি দেখছেন। গর্বে তার বুক ফুলে ফুলে ওঠে। যাবার সময় সবিতাকে বলেন, এবার তুই একাই আসবি মা। আমার আসার আর দরকার নেই। কাজ-কর্ম কেমন হবে তুই বুঝে নিবি। এতগুলো চাষীর জীবন রক্ষা করতেই হবে। শেষের কথাগুলো ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেন। গোয়েন্দা পুলিশ যেন শুনতে না পায়।

সবিতা বলে, দেশময় জোরালো আন্দোলন। খুব বেশিদিন ওরা আটকে রাখতে পারবে না।

॥ ১১ ॥

রিভিশনাল সেটেলমেণ্টের কাজ গ্রামের কোণে-কোণে রীতিমত ঢেউ তোলে। মোড়লবাবুদের পোড়ো-বাড়ির মাঝখানে অপেক্ষাকৃত চলনসই ঘর বেছে নিয়ে অফিস তৈরি হয়েছে। কয়েকখানা ঘরে থাকে অফিসার কর্মচারী আর পিওনের দল। অফিস খোলার আগে-পরে লোকজন উঁকি-ঝুঁকি মারে এখানে। পিওনদের সঙ্গে অনেকের একান্তে অর্থপূর্ণ কথাবার্তা হয়। চুপি-চুপি কেউ-কেউ সঙ্গী-ধরে এ্যাটেস্টশান অফিসারের ঘরে ঢুকে যায়। কিছু পরে হাসিমুখে ফিরে আসে। কারো গম্ভীর মুখ দেখলে হাসি পায়।

এ্যাটেস্টশান ক্যাম্পে আমোক্তারনামার ব্যবস্থা হয়েছে। বাদী কিংবা প্রতিবাদী তিন টাকার নন্‌জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের ওপর সই করে, তার হয়ে—কোন-ব্যক্তিকে অফিসারের সামনে বলার অধিকার দিতে পারবে। সবিতা ঐশ্বর্যগড়ের চাষীদের হয়ে কথাবার্তা বলছে। সঙ্গে সাহায্য করছে কালিদাস বেরা। চাষীদের এ ব্যাপারে উৎসাহের অন্ত নেই। একটা কথা আজ সবার সামনে রীতি-মত স্পষ্ট। কোন বিশেষ নেতার নেতৃত্ব নয়—যৌথ নেতৃত্বই গণ-আন্দোলনের মূলধন। দায়িত্বশীল নেতা যৌথ নেতৃত্ব তৈরির দিকে বিশেষ ভাবে ঝোঁক দিয়ে থাকেন।

শতদ্রু গ্রেপ্তার হবার পর কৃষক মহলে যে মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছিল তা আস্তে আস্তে কেটে যায়। অনেকে বলছে, দিদিমণি থাকলেই এখন কাজ চলে যাবে। এই সমস্ত মানুষের কথাই আজ ভাবছিল সবিতা। মোটামুটি কাজ-চালান অবস্থা পেলেই এরা খুশি। কিন্তু এরা জানে না—এই অবস্থা সৃষ্টি করার জন্যে কি নিরলস পরিশ্রম প্রয়োজন।

সাদা তোয়ালে ঢাকা একটা ধামা নিয়ে অফিসের সামনে আসেন জগদীশ্বর আচার্য। একজন পিওন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলে, আসুন আসুন—সাহেব আছেন। জগদীশ্বরবাবু পিওনের সঙ্গে ঘরে ঢুকে যান। পরে জানাজানি হয়ে যায়, জগদীশ্বরবাবু বাড়ি থেকে নানা ধরনের পিঠে আর মিষ্টান্ন তৈরি করে ভেট দিতে এসেছেন। তার সঙ্গে যে আরো কিছু ছিল—সেকথা না বলাই ভাল। কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। এখনো পর্যন্ত মানুষ তাকে রীতিমত শ্রদ্ধা করে।

কয়েকজন ঠিকে প্রজার নাম আর তাদের জমির পরিমাণ এদিক-ওদিক করার জন্যে তিনি এই বেশে এই সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সবিতা হাসি চাপতে পারে না। মুখ ঘোরায়। উপেন ঘোষ পাশে দাঁড়িয়েছিল—অবস্থা দেখে বলে ওঠে, দিনে দিনে আরো কত দেখাবি মা তারা! আমরা সবাই জানতুম জগদীশ্বরবাবুর মত মানুষ এ তল্লাটে নেই। তিনিও দেখি আজ অন্ধকারে বাঁকা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পরক্ষণে শশী মোড়লের বাঁধা গান আরম্ভ করে দেয়ঃ

মেছো-দাদা—মাছের বেলায় চোখে কাদা,
চাষীর হেদয় ধানে—
জমি-টাকার উঠলে কথা, টান পড়ে যায়—
বাবুর প্রাণে।
তখন ভাল মানুষ ভেটিয়ে যায় রে
সে কথা ছইড়ে দিনু গানে ॥

গানের শেষে উপেন সবিতার দিকে তাকিয়ে বলে, তোমরাও সাবধান। গোলাপ বাগানের চারপাশে ঠিকমত বেড়া না দিলে—একদিন দেখবে, সব গোলাপ সাবাড় হয়ে গেছে। বৃথাই কাঁটা ঝোপ পাহারা দিচ্ছ।

আগে মোড়ল বাবুদের বাড়ির কি রমরমা ছিল। সতেরো চুড়ো বিশাল রথখানার আজ আর কোন অস্তিত্বই নেই। হাজার হাজার বাড়ির ইট ঝরে পড়েছে। বিশাল পুকুরটার চারপাশে ত্রিশ চল্লিশখানা সুউচ্চ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। ভাঙা শানের-ঘাট। সর্বত্র মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে কদম্ব-বট-অশ্বত্থ-শেওড়া-খেজুর-তাল-কেলকদম গাছের দল। এখানে একটা কথা সরবে ঘোষিত হচ্ছে, পৃথিবীতে মানুষের হাতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে—উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে কালস্রোতে তা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

কচিরাম পণ্ডুর দল এসে পড়ে এর মধ্যে। সবিতাকে বিমর্ষ অবস্থায় থাকতে দেখে বলে, কি হলো গো দিদিমণি, এমন মন-মরা হয়ে দাঁড়িয়ে কেন? সবিতা নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, তোমাদের আসার পথের দিকে তাকিয়ে বসে আছি। এসে গেলেই খেতে যাবো। পাশেই আমার বন্ধুর বাড়ি।

জানি গো জানি। জগন্নাথ পণ্ডিতের বাড়ি কি হাজার কোশ দূরে! যাও তাড়াতাড়ি খেয়ে এসো।

পথে পা বাড়ায় সবিতা। মনে প্রাণে সে আজ শতদ্রুর অভাব বিশেষভাবে

উপলব্ধি করে। এটা কি তার দুর্বলতা ? তা যদি হয় তাহলে দারুণ ক্ষতির ইঙ্গিত বহন করছে। এতগুলি মানুষের জীবন-মরণ সমস্যা নিয়ে এক মুহূর্ত অসতর্ক হওয়া যায় না। শতদ্রু পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেছে আইনজ্ঞ রমাপদ-বাবুর সঙ্গে। ঝামেলা বাড়লেই তার কাছে উপস্থিত হচ্ছে সবিতা। সাহায্য পেতে এতটুকু অসুবিধা হচ্ছে না। রমাপদবাবুর কয়েকজন তরুণ বন্ধুও এ ব্যাপারে রীতিমত সাহায্য করে যাচ্ছেন।

প্রথম প্রথম অফিসারের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় সবিতার বুক কাঁপতো। আজ তার বালাই নেই। এ অবস্থাতেও মনটা কেন বারবার শতদ্রুর দিকে তাকাচ্ছে ? মুচকি হাসে সবিতা। সে আসলে একজন মেয়ে ছাড়া তো আর কিছু নয়। তার সামনে সুদর্শন ঝকঝকে-তকতকে শতদ্রুর একটা আকর্ষণ তো থাকবেই। বেশ কিছুদিন কাছাকাছি থেকে সাহচর্যের গাঢ়ত্বকে সে অস্বীকার করবে কী করে? কয়েকদিন আগে জেলে ইণ্টারভিউ সেরে বিদায় নেবার সময় শতদ্রুর চোখে এক অন্য জগতের ছবি দেখেছে সবিতা। এটাকে বন্দী জীবনের সাময়িক দুর্বলতা বলে মনে হয়েছিল। শতদ্রু একে অনায়াসে জয় করে নিতে পারবে। সবিতা আরো অনেকবার এ জিনিস লক্ষ্য করেছে। রীতিমত সতর্কতার সঙ্গে বর্তমানে পথ চলে সে। আজ কিন্তু মনের গভীরে নীরবে যে স্রোতধারা বয়ে চলেছে—সেদিকে তাকিয়ে নিজের মনের আসল চেহারাটা বুঝে নেয় সবিতা। সত্যকে অকপটে স্বীকার করে মনখানা এক অনির্বচনীয় প্রসন্নতায় ভরে ওঠে।

কাজকর্ম শেষে বাড়ি ফেরার পথে পঞ্চু বলে, আজ 'জানটা' কি চাইছে গো দিদিমণি ? ঠাণ্ডা—না গরম ?

সারাদিন তো গরমে গরমে গেল পঞ্চুদা। এখন একটু ঠাণ্ডার হাওয়া বইয়ে দাও। সহাস্যে বলে সবিতা।

পঞ্চু মোড়ল মাথায় আঙুলের টোকা মেরে একটু যেন নেচে নিয়ে বলে, ঠাকুর্দা ঠিক এই কথা বলতো। দইয়ের সরবতের নাম শুনলেই ধপ করে বসে পড়তো।

গোয়লাপাড়ার ধারে খাঁটি-দইয়ের আখড়ায় অন্য কোন জিনিস মুখে দিতে ভাল লাগে দাদা ? উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে সবিতা।

সবাই কথাটাকে সমর্থন করে বলে, তা ঠিক। পুরোপুরি সঠিক।

দইয়ের সরবত খেতে খেতে কাঁচরাম বলে, আজ হাকিমকে ভারি বেকায়দায়

ফেলেছিলে দিদিমণি। আগে আমরা বুঝেই উঠতে পারিনি—এত বাঁধাছাঁদা কেন? এত কথা জিজ্ঞেস করছোই বা কেন? শেষে আসল ব্যাপারটা বুঝে আমাদের চোখ একেবারে কপালে উঠে যায়। বাব্বা! এত বুদ্ধি তোমার?

আজ সবিতা ভবানীবাবুর সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করে, আপনাদের গোমস্তা বাবুর নাম কী?

শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সরকার।

তাঁর কাজ কী?

কাছারির কাজকর্ম দেখাশুনা করা।

দারোয়ান পাইক বা ঐ জাতীয় কোন লোকজন আছে কী?

দারোয়ান থাকবে না? এত বড় জমিদারী।

দারোয়ানদের কাজ কী?

কাছারি বাড়ির কাজকর্ম দেখাশোনা। টাকাকড়ি আদায় করা।

টাকাকড়ি কারা দেয়?

যারা জমি চাষবাস করে। কথাটা বলে রীতিমত ঘাবড়ে যায় ভবানীবাবুর সাক্ষী। পরে ঢোক গিলতে গিলতে বিষয়টা বিশেষভাবে সংশোধন করে নিয়ে বলে, কিন্তু আজকে যে লোকজন এখানে এসেছে—এরা কেউ টাকাকড়ি দেয় না বা জমিও চাষ করে না হুজুর। এরা প্রজা নয়।

সবিতা চেপে ধরে। বলে, ঠাকুরঘরে কে রে? সেই ব্যাপার ঘটে গেল। বোঝা গেল ব্যাপারটা। ভবানীবাবুর দারোয়ানদের হাজির করতে হবে এখানে। এরা এদের জমির জন্যে টাকা নেয় কিনা, উপস্থিত না করলে—আদৌ পরিষ্কার হবে না বিষয়টা।

ভবানীবাবুর সাক্ষী গোপাল কাঁজি বলে, ওরা সব দেশে চলে গেছে। এখানে নেই হুজুর।

কাঁচিরাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, এখানেই আছে হুজুর। ঐ তো নিম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে। লাঠি হাতে।

ডাক পড়ে রাম পীরিতের।

রামপীরিতের সাড়ে ছ'ফুট দশাসই চেহারাটা ঈষৎ কাঁপতে থাকে জেরার সামনে। সবিতা জিজ্ঞাসা করে, বলুন রামপীরিতবাবু আপনি কি কাজ করেন?

ভোবানীবাবুদের দারোয়ানের কাম করি।

কত বছর ?

তা করিপ ছাব্বিশ সাতাইস সাল হোবে।

কী কাজ করতে হয় আপনাকে ?

কাছারি বাঢ়িকা খবর বাঢ় বাঢ় পোঁছদেনা।

কিসের খবর ?

খাজানাকা খবর।

কারা খাজনা দেয় রামপীরিতবাবু ?

জমিন চাষ করনেবালা আদমী।

এখানে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের কেউ জমির খাজনা দেয় ?

হাঁ।

দেখান—কারা খাজনা দেয় ?

রামপীরিত আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে বলতে থাকে, কচিরাম পঞ্চু হারান—

আগে থেকে সতর্ক না থাকায় নির্বিবাদে সবার নাম বলতে থাকে রামপীরিত। ভবানীবাবুর উকিল রাগে গরগর করতে থাকে এই ধরনের হাটে হাঁড়ি ভেঙে যাওয়ায়। অবিনাশবাবু দাঁতে দাঁত রেখে বলতে থাকেন, ঝানু মেয়েটা সব ডোবাল। ছোঁড়া আচ্ছা মন্তর ঢুকিয়ে গেছে—

সবিতা এ্যাটেস্টশান অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলে, দেখে নিন স্যার। পুরোপুরি সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলে যাচ্ছি।

অবিনাশ ঘোষাল পানের রক্ত-রস-ভরা থুথু ছড়াতে-ছড়াতে চেঁচাতে থাকেন, আমরা যা বলছি সব মিথ্যে। উনিই শুধু সত্যি কথা বলে যাচ্ছেন। সত্যিবাদী যুধিষ্ঠির।

এ্যাটেস্টেশান অফিসার রীতিমত ক্ষেপে যান। বলেন, কাউকে আক্রমণ করে কথা বলছেন কেন ? যদি কোন প্রমাণ থাকে দিন।

প্রায় প্রতিদিন একটা না একটা দরখাস্তের শুনানীর দিন পড়ছে। প্রতিদিন সবিতাকে হাজির হতে হচ্ছে। একটা জিনিস আজ উপলব্ধির সীমায় এসেছে, 'ঐক্যবদ্ধ না হলে এ কাজ করা আদৌ সম্ভব হতো না। যা করা হচ্ছে তার পদ্ধতিটা আগেভাগে রপ্ত না থাকলে ভরাডুবি হতে হতো। শতদ্রুর অসীম ধৈর্য আর সহ্য করার শক্তি অবস্থার এই বিরাট পরিবর্তন

সৃষ্টি করেছে। শতদ্রু নেতা।'

মাঝে একদিন এ্যাটেস্টশান ক্যাম্পে আসেন শচীপতি আর ভূপতিবাবুরা। সবিতার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। সবিতা সহাস্যে বলে, আপনাদের উকিলবাবু সমানে বলে যাচ্ছেন জমিতে ভবানীবাবু নেই প্রজারাও নেই। সব খাস জমি।

তাছাড়া আমাদের বলার আর কি আছে বলুন? কথাবার্তার সময় পঞ্চু কচিরামরাও পাশে থাকে।

শচীপতিবাবু বলেন, আপনারা শতদ্রুবাবুর সঙ্গে দেখা করে বলুন—আমাদের প্রস্তাব ব্যাপারে কি ভাবছেন তিনি?

সবিতা ধীর কণ্ঠে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, যাদের জমি আছে তারা কিছু জমি আপনাদের ছেড়ে দিল কিন্তু যে সমস্ত জমিতে গৃহস্থ প্রজারা আছে, সামান্য ডাঙা ছাড়া যাদের আর কিছু নেই—তারা কি দেবে?

তারা অন্যভাবে কিছু দিক।

অন্যভাবে কিছু দেওয়া এদের পক্ষে সম্ভব নয়। শহরে থেকে আপনারা ঠিক বুঝবেন না। কোম্পানীর কেনা-জমির একটা বিরাট অংশে ঘরবাড়ি পুকুর-ডোবা-গাছপালা নিয়ে বাস করে অসংখ্য প্রজা। কয়েকপুরুষ তারা এখানে বসবাস করছে। কারখানা তৈরি করলে, কোম্পানীকে বাড়িঘর থেকে এই সমস্ত পরিবারকে উচ্ছেদ করতে হতো। ওরা বসতপ্রজা হিসেবে ছিল—আজো আছে। ওদের থেকে কি চাইবেন আপনি? ওরাই বা কি দেবে? একদিন অনুগ্রহ করে ঘুরে আসুন এই পাড়ায়। সবকিছু বুঝতে পারবেন।

শচীপতি ভূপতিবাবুরা কোন জবাব দেন না। শুধু শুনে যান সবিতার কথা। শেষে বলেন ভূপতিবাবু, যাদের কাছে শালি জমি আছে ওরা কিছু দিক।

সবিতা খুব সংযতভাবে বলে, আপনাদের কথা আমি সমিতির কাছে রাখব। একটা জিনিস এখানে খুবই পরিষ্কার—যে টাকায় অনেকদিন দেওয়ানী ফৌজদারী মামলা করতে হবে—তার একটা অংশ যদি আপনাদের হাতে দেওয়া যায় মন্দ কি! মনে মনে ভাবে সবিতা, সামন্ততন্ত্রের শেষ প্রভুদের বিষ না থাকলেও কুলোপানা চক্কোর তো থাকবে। অসহায় কৃষকেরা নাজেহাল হয়ে যাবে ওদের ছোবলে ছোবলে।

একটা নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে যায় শচীপতি ভূপতিবাবুরা। চাষীদের মধ্যে প্রায় সবাই আসল জিনিসটা বোঝে। শতদ্রুর অনুপস্থিতিতে

কোন দুর্বল-খাদ তৈরি হয়নি এদের মধ্যে।

সবিতা অকুলসমুদ্রে পড়ে যায় এক সময়ে। কলকাতায় জমি ব্যাপারে কথাবার্তা চলেছে। এলাকায় ভবানীবাবু আর অবিনাশ ঘোষাল মরিয়া হয়ে উঠেছেন। রীতিমত সুরক্ষিত দুর্গের-আদলে ঐশ্বর্যগড় দিনরাত ডগমগ করছে। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হয়েছে কয়েকটি অনুষ্ঠানে। বঙ্কিম মুখার্জী নিজে উপস্থিত থেকে কয়েকটি গ্রুপ সভা করেছেন। এই সমস্ত কিছুর 'টাল' সামলাতে হচ্ছে সবিতাকে। প্রতিনিয়ত।

দাওয়ায় খেতে বসে সেদিন অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবতে থাকে সবিতা। মা কয়েকবার লক্ষ্য করেও কিছু বলেন না। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে কাটার পর কাছে এসে বলেন, কি অত ভাবছিস মা ?

সবিতা চমকে মায়ের দিকে তাকায়। গোরাচাঁদবাবুও এসে পড়েন কাছাকাছি। বার্ধক্যে ন্যুব্জ শরীরের মধ্যে থেকে একজোড়া সরল-স্বচ্ছ-দৃষ্টি সবিতার দিকে রেখে বলেন, জমিদারবাবুরা কি নতুন কোন ঝামেলা সৃষ্টি করেছে মা ?

সবিতা মুখের খাবার কয়েকবার চিবিয়ে নিয়ে ভার কমিয়ে বলে, এখন তো বাবা—শুধু তোমার পাঁচ বিঘে জমির ভাবনা নয়। সারা ঐশ্বর্যগড়ের জমি এসে মাথায় চেপেছে। শয়তানদের লাঠি তাক করছে আমার মাথা। মীমাংসার কথাবার্তা চলেছে—সেও আমার মাথায়। তাই একটু বেসামাল অবস্থায় পড়েছি বাবা।

এই সময়ে মাথাটা খুব ঠাণ্ডা রেখে চলবি মা।

মা সারদাময়ী পাথরবাটিতে আর একটু টক ঢেলে দিয়ে বলেন, ভাত কটা খেয়ে নে।···দিন দিন তোর খোরাক কমে যাচ্ছে। এমন পাখির-খাওয়া খেয়ে কদিন বাঁচবি মা ?

সবিতার মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে। খাবার চিবুতে-চিবুতে ভাবে এমন পিতৃ-মাতৃস্নেহ ক'জনের ভাগ্যে জোটে ? আজকাল সন্ধ্যায় সারাদিনের কাজের শেষে সবিতা বাবা মাকে নিয়ে বসে। পরামর্শ করে। গোরাচাঁদ চক্রবর্তী বা সারদাময়ীর কথাবার্তা এখন ব্যক্তিচিন্তার উর্ধ্বে চলে গেছে। গিরিখাদ পার হয়ে গেছে সবিতা। নিবিড় এক আনন্দ তার হৃদয়ে মৃগনাভির সৌরভ ছড়ায় যেন।

॥ ১২ ॥

বিকালে একটা খবর নিয়ে আসে পণ্টু। সামনে বুধবার বিচারপতি সুরজিৎ লাহিড়ী আর কয়েকজন বিচারপতির বিশেষ আদালতে শতদ্রুকে উপস্থিত করা হবে। তার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনা হয়েছিল—তার প্রমাণ অভাবে তাকে আর ধরে রাখা যাবে না।

খবর শুনে সবিতা বলে, এ কথা তুমি জানলে কি করে?

পণ্টু কপালে কয়েকবার টোকা মেরে—নাটকীয় কায়দায় বলে, চিঠি আছে।

কই চিঠি? হাত বাড়ায় সবিতা।

ফতুয়ার পকেট থেকে একখানা পোস্টকার্ড বার করে সবিতার হাতে দেয় পণ্টু। এক লাইনের একটা ছোট্ট বয়ান, আগামী বুধবার ১০ই মার্চ বিচারপতি সুরজিৎ লাহিড়ী আর কয়েকজন বিচারপতির বিশেষ-আদালতে আমাকে যাওয়া হবে। ইতি—শতদ্রু

পণ্টু লক্ষ্য করে, চিঠিখানা হাতে নেবার সময় সবিতার যে ভাব ছিল—দ্রুতগতিতে তা অন্তর্হিত হয়। দীপ্তিহীন পাংশু মুখে সবিতা পণ্টুর দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় বলে, এর মধ্যে তুমি আবিষ্কার করলে—ওরা ছেড়ে দেবে?

দেবে না? পণ্টু রীতিমত অবিচলিত কণ্ঠে কথাটা বলে।

সবিতা ধীরে ধীরে বোঝায় পণ্টুকে, পোস্ট অফিসে চিঠি আসার সঙ্গে সঙ্গে ভুতো সরকার কথাটা ছড়িয়ে দিয়েছে। ছেড়ে দেবার কথাটা বলেছে নিশ্চয় বিদ্রুপ করে। মামলা আদালতে উঠলেই নির্দোষ প্রমাণ হবে না ভাই। এমন তো হতে পারে—আরো অনেক দোষ ঘাড়ে চেপে যাবে। আরো অনেক দিন জেল খাটতে হবে। পুরাতন ইতিহাস জানা আছে তো? এসব ক্ষেত্রে যারা দেশ শাসন করেন—তারা প্রয়োজনমত সাক্ষী-প্রমাণ যোগাড় করে নেন। কেস ভারি করে দেন। সবিতার ব্যাখ্যা মন দিয়ে শোনে উপস্থিত সবাই। মলিন মুখে দাঁড়িয়ে থাকে।

বুধবারের পরে জেলে দেখা করতে গিয়ে চমকে ওঠে সবিতা। এ কি উল্লসিত হাসিভরা মুখ শতদ্রুর! তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নেয়। সর্বাণীও কারণ বুঝতে পারে না এই হাসির। শতদ্রু ধীরে ধীরে বিশেষ আদালতে যাবার বর্ণনা দেয়। আই বি'র বিশেষ জোয়ান পুলিশটি বলে, শুনুন মা

আদালতের বর্ণনা। কথা শেষে মুচকি হেসে একটু দূরে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে।

শতদ্রু বলে যায়, সকাল বেলা স্নান সেরে সামান্য কিছু খেয়ে একটা বিশেষ গাড়িতে উঠি। আগে-পিছে রাইফেল উঁচিয়ে বসে থাকে পুলিশ। মহাকরণে বিশেষ আদালত বসে। পুলিশ বেষ্টিত হয়ে নির্দিষ্ট কক্ষের দিকে যাই। আশেপাশে অসংখ্য মানুষ দেখে আমাদের। তাদের কথার থেকে কারণ বোঝা যায়। পুলিশ-থানা পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল—ধান লুট করতে গিয়েছিল, খুন করতে গিয়েছিল জমির মালিককে, জঙ্গলে গোলা-বারুদ লুকিয়ে রেখেছিল—এ্যাকসানের ব্লু-প্রিন্ট সমেত ধরা পড়েছে—খুনে-ডাকাত সব—ওদের ছাড়বে কেন?

সর্বাণীর চোখের তারা দৃপ্ত হয়ে ওঠে। একদল দরিদ্র কৃষককে অন্যায়ভাবে ছিন্নমূল করার যে জঘন্য চক্রান্ত তৈরি হয়েছে তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে একদল শাঁসে-জলে-থাকা জমি-অর্থের মালিক—প্রশাসনযন্ত্র হাতে নিয়ে। এই মানুষ-মারা যজ্ঞের বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়াই করে যাচ্ছে শতদ্রু। আনন্দে সর্বাণীর বুক ফুলে ওঠে।

কী ভাবছ মা?

হাসি মুখে বলে সর্বাণী, কিছু না।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে শতদ্রু। বলে, তোমার মুখে এই ধরনের হাসি দেখলে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজটাও করে আসতে পারি।

আশীর্বাদ করি বাবা, মানুষের কল্যাণে তোমার পবিত্র শক্তি যেন ব্যয় হয়। তোমার পূর্বপুরুষ শয়তানের চাকার তলায় পড়ে শুধু চিৎকার করেছে আর ভগবানকে জানিয়েছে। এতে কাজের কাজ হয় না। অবস্থাকে আয়ত্তে আনতে লড়াইয়ে নামতে হয়। তুমি সে কাজ করছো।

শতদ্রুর চোখ ছলছল করে ওঠে। কিছুক্ষণ মায়ের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকে। চোখের জল মুছে বলে, আজ একটু আগে যাও মা। অন্ধকার রাত। সবিতা নীরব দর্শকের মত দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ। চোখ মুছে ধরাগলায় বলে, আমি আলো এনেছি। অসুবিধা হবে না। তাছাড়া স্টেশন থেকে নিয়ে যাবার লোক তো আছেই।

কয়েকদিন পরে সত্যিই জেল থেকে ফিরে আসে শতদ্রু। দলে দলে

চাষীরা ছুটে আসে। মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে। নানা ধরণের প্রশ্ন করে তারা। ঘানাগাছে গরুর কাজ করতে হয়েছে কিনা থেকে শুরু করে—কি খেতে দিয়েছে পর্যন্ত। শতদ্রু হাসি মুখে সব প্রশ্নের জবাব দেয়। জ্ঞানদাময়ী একটু কাহিল হয়ে পড়েছেন। কথাও ঠিক মত শুনতে পাচ্ছেন না। এই অবস্থাতেই একমুখ হাসি নিয়ে বলেন, রাজ্য জয় করে এলি দাদা। একজন গিয়েছিল। সে তো আর ফিরে এলো না। তুই আমার সামনে একটা নতুন নজির তৈরি করলি ভাই।

শতদ্রু শান্ত সংযত কণ্ঠে বলে, তোমাদের পায়ের তলায় দাঁড়িয়ে যে কাজে হাত দোবো তার একটা বিশেষ মর্যাদা তো থাকবেই।

জেলে গিয়ে একটা নতুন জগতের সন্ধান পেয়েছে শতদ্রু। কারাগার যেন বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে এসে সারা পৃথিবীর দিকে চোখ ফেরাতে পেরেছে সে। তাছাড়া নিজের দেশকে ভাল ভাবে জানতেও পেরেছে। আগে তার সামনে ছিল শুধু ঐশ্বর্যগড় গ্রামের সমস্যা। এখানে কিছু দরিদ্র কৃষককে জমি থেকে উৎখাত করতে চায় প্রভাবশালী কিছু মানুষ। বাঁচার অসীম আগ্রহে তারা জমি রক্ষা করার জন্যে মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এদের উষ্ণ নিঃশ্বাসের ওঠাপড়া ছন্দের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করছে শতদ্রু। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে চটকলের শ্রমিক। যাদের ওপর দিনরাত অত্যাচার অবিচার জুলুম শোষণ চলেছে একটানা। ধীরস্থির ভাবে চিন্তা করে দেখেছে সে, মালিকেরা এমন সব জায়গায় কারখানার স্থান নির্বাচন করে—যেখানে কাঁচামাল, যাতায়াত ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সস্তায় প্রয়োজনের তুলনায় অনেক—অনেক গুণ বেশি মজুর পাওয়া যায়। আজ দেখছে—সারা পৃথিবী জুড়ে একই ধাঁচের ব্যবস্থা চলেছে।

সস্তায় মজুর কথাটা শুনলে শতদ্রুর হাসি পায়। পরক্ষণে মাথা ঝিম্-ঝিম্ করে। মালিক শ্রেণী ন্যূনতম বেতন না দিয়ে—পুরো কাজ আদায় করে নেয়। উৎপাদন করা জিনিস অনেক বেশি দামে দেশে-বিদেশে বিক্রী করে। কায়দা করে অল্প দামে কাঁচা-মাল কেনার জন্যে বা শ্রমিক-শোষণ-ব্যাপারে এদের ওপর বলার কেউ নেই। দেশের কর্তাব্যক্তিরা এই সমস্ত মালিকদেরই সাহায্য করে। অগত্যা শ্রমিকদের নামতে হয়েছে লড়াইয়ের ময়দানে। এদের অসহায় অবস্থার দিকটি তার সামনে একদিন খুব সহজভাবে তুলে ধরেছিলেন বঙ্কিম মুখার্জী। সেদিন হাঁ করে তাকিয়েছিল শতদ্রু। বুঝেছিল একদল জমির মালিক আর দেশী-বিদেশী পুঁজির মালিক দিন দিন কেমন কায়দায়

কোটি কোটি মানুষের মুখের গ্রাস অন্যায়ভাবে কেড়ে নিচ্ছে। একজোড়া নতুন চোখ নিয়ে সেদিন বাড়ি ফিরে এসেছিল শতদ্রু। রাত্রিতে খাবার সময় মায়ের কাছে কথাগুলো বলেছিল। ঠাকুরমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, আমার বুকে দারুণ যন্ত্রণা ভাই। পারবি তুই ঝড়ঝাপ্টার মধ্যে পথ হেঁটে অসংখ্য মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে? সেদিন পিছন ফিরে তাকিয়ে বাবাকে এক অদ্ভুত অবস্থায় দেখেছিল শতদ্রু। তার চোখ দুটো ছিল অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। বাবার এমন দৃপ্ত চেহারা শতদ্রু জীবনে কোনোদিন দেখেনি! সেদিন কোন কথা বলেননি রাজেশ্বর তর্করত্ন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চলে গিয়েছিলেন।

জেলে বসে শতদ্রু সারা ভারতবর্ষের চেহারাটা অনুমান করার চেষ্টা করেছে। বিভিন্ন ধরনের মানুষ এক জায়গায় এসে জমা হয় আর তাদের মনের অর্গল পুরোপুরি ফাঁকা হয়ে যায় এই পরিবেশে। পরমেশ্বর সাউ এখানকার কাজের হিসাবে 'ফালতু'। সারা দুপুর শতদ্রুর সেলের সামনে বসে অবিরাম কাহিনী শুনিয়ে যায়। একসময় বলে সে, আপনারা বড়লোকেদের মুখের-গেরাস টেনে নেবেন—তারা তাদের সরকারী যন্তর দিয়ে টেনে আনবেনে আপনাদের? দমন করার চেষ্টা করবেনে? শতদ্রু অনুগত ছাত্রের মত এদের কথা শুনেছে আর তা থেকে মূল্যবান-সঞ্চয় পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে গেঁথে রেখেছে।

নকুল মাহাতো যতীন সতীশকে দেখলে কার-না ভয় হবে? খুনী আসামী ওরা। দাড়ি-গোঁফ চোখ-মুখে জীবন্ত-ত্রাস। বিড়ি-সিগারেট যোগাড় করতে আসতো ওরা সেলের বন্দীদের কাছে। ব্লেড যোগাড় করে অনেকে ওদের কাছে দাড়ি কামাতো। আঙুল দিয়ে ব্লেডের মাঝখান পাকড়ে দ্রুতগতিতে কাজ-সাফ করতে ওরা ছিল ওস্তাদ। অনেকের মাথা-গা-হাত টিপে দিত ওরা। শতদ্রু বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত। যে কোন মুহূর্তে ওরা তো গলায় ব্লেড চালিয়ে দিতে পারে! জীবনটা যখন যাবে—আর একটা খুন করতে ওদের বাধা কোথায়? একদিন ওরা পাকড়াও করলো শতদ্রুকে। মাথা চুলকোতে চুলকোতে কাছে এসে চোখ দুটো রাখল শতদ্রুর চোখের ওপর। ধীর গলায় বললো, শয়তানরা খুব ভোগাচ্ছে শুনলুম। গরীব মানুষের আশীর্বাদ থাকলে তোমার কিছু করতে পারবেনে দাদাবাবু। যতীন আর নকুল কাছাকাছি এসে যায়। সশব্দে আঙুল মটকাতে মটকাতে বলে, শুয়োরগুলোকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলতে ইচ্ছা করে। সতীশ কথায় একটু টান দিয়ে বলে, সামনে পেলে

তো ? শালারা ইস্পাতের পাঁচিল-তুলে নিশ্চিন্তে বসে আছে—তাছাড়া আছে ঘরশত্রুরদল। গরীব মানুষদের ভাল হতে দেবে ওরা ?

কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায় শতদ্রুর চিন্তাভাবনা। একটু আগে পর্যন্ত যাদের দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছিল এখন সহানুভূতির রোদ্দুর লেগে সেই ভীতির-বরফের-চাঙড় গলতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যে শতদ্রুর মনের খুব কাছাকাছি এসে যায় খুনী আসামীরা। কিছু বিড়ির ব্যবস্থা করে শতদ্রু শুনতে বসে এদের খুনের কাহিনী। সতীশ বলে, সবকিছু শোনার পর আপনি যদি মনে করেন আমরা অন্যায় করেছি—

শতদ্রু কথার মাঝখানে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলে ওঠে, ন্যায় অন্যায়ের ব্যাপারটা পরে ঠিক করা যাবে। আগে বল—কি হয়েছিল ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাহিনী শুরু করে নকুল মাহাতো। প্রথমেই সে জোরের সঙ্গে বলে, হাঁ আমি বাদল দাসকে খুন করেছি। করবো না ? বাদল আমার সব কেড়ে নিয়েছে। তাই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি আমি। তিনজন খুনী আসামীর চোখে তখন আগুন জ্বলছে দাউ-দাউ করে। শতদ্রু একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। তার ব্যবহারের মধ্যে কোন আঘাত পায়নি তো ওরা ?

নকুল বলে চলে, আমার তেরো-পো শালি জমি আর তার লাগোয়া চার বিঘে ডাঙার ওপর লোভ ছিল বাদলের। আমার মাথাটা বরাবরই গরম। এই গরম-মাথার পুরোপুরি সুযোগ নিয়েছিল বাদল। পিছনে লোক লাগিয়ে ঝগড়া মারামারি আরম্ভ করিয়ে দেয় সে আমারই এক আত্মীয়ের সঙ্গে। গুচ্ছের তাড়ি-মাড়ি খেয়ে সে আমার নাকে ঘুষি মারে। আমিও অনন্ত শিউলির হাত থেকে হেঁসো ছিনিয়ে নিয়ে তার দাবনায় বসিয়ে দিই ! ব্যাস। মামলায় পাঁচ বছরের জেল। ওদের ভাল ভাল উকিল আর আমার পক্ষে মধু মোক্তার ! এতে কী আর কিছু হয় ? কোর্টে টাকার খেলা। টাকা থাকলে খুন করেও হাসতে-হাসতে জেল-না-খেটে ফিরে আসা যায়।

একটু ঢোক গিলে নকুল আবার আরম্ভ করে, বৌ আসতো ছেলেটাকে নিয়ে। ভেবেছিনু এমনি করে পাঁচটা বছর কোন রকমে কেটে যাবে। কিন্তু তা আর হোল না দাদাবাবু। ছেলে-বৌয়ের আসা বন্ধ হয়ে গেল। দিনের পর দিন দুশ্চিন্তা বাড়তে আরম্ভ করলো। জেলের জীবন রীতিমত দুঃসহ হয়ে উঠল। দগদগে-ঘা একদিন যেমন শুকিয়ে যায়। তেমনি যন্ত্রণা-জ্বালা কমতে থাকে ধীরে ধীরে। বছর তিনেক পর একদিন মর্মঘাতী দুঃসংবাদ বয়ে আনে

কুসুমপুরের চুনিলাল। ভায়ে-ভায়ে মারপিট করে জেলে আসে। সে বলে, 'নকুলদা—তোমার তের-পো জমির উপর বড় পুকুর তৈরি করেচে বাদল। ডাঙার চারদিকে ইটের পাঁচিল দিয়ে বাস্তুর সঙ্গে একলপ্তে মিশিয়ে দিয়েচে। তোমার ইস্তিরি বাদল দাসের ঘরে ঢুকেচে। তুমি নাকি তার কাছে বন্ধক রেখে ছিলে। ছেলেটার কোন পাত্তা নেই।' খবর শুনে মাথা ঘুরে পড়ে যাই আমি। আমার আর কিছু নেই। ক'টা বছর জ্যান্তে-মরার মত কাটিয়ে মেয়াদ শেষে জেল থেকে বার হই।

সেদিন সন্ধ্যায় বিশ্বাসী সাঙাত যতীশ সতীশের সঙ্গে যোগাযোগ করি। ওরাও রীতিমত ক্ষেপে ছিল। আমার বুকের জ্বালা ওদের বুকেও আগুন ধরিয়ে দেয়। জোর জবরদস্তি করে ওদের বৌঝিদের ধরে নিয়ে যেতো বাদল দাস। তাই আমার প্রস্তাব দেবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা রাজি হয়ে যায়। রাতের অন্ধকারে আমাদের চলাফেরা চলে। সুযোগ খুঁজতে থাকি আমরা। কিছুক্ষণ থেমে—যথাসম্ভব আস্তে আস্তে বলে নকুল, একদিন দুপুরে খবর পাই বাদল দাস তার পেয়ারের রওশন শেখকে নিয়ে তাগাদা সেরে কুমড়োখালির বাদার উপর দিয়ে আসচে। সঙ্গে রওশন ছাড়া আর কেউ নেই। বৈশাখের খাঁ-খাঁয়ে রোদ্দুর আর এলোমেলো-বাতাস আমাদের মনে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার নিসপিসুনি এনে দেয়। এ সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। রাম-দা নিয়ে তিনজন ছুটে যাই।

কুমড়োখালির বাদার মাঝখানে নতুন পুকুর কাটা হচ্ছে—আশপাশের জমিতে সেচ দেবার জন্যে। গলা ঝেড়ে থুথু ফেলে কথাগুলো বলে নকুল। এরপর আবার শুরু করে, পুকুরের বাঁধের ধারে এসে বিকট-ধরনের একটা চিৎকার করি আমরা। বাঁধের আড়ালে এতক্ষণ আমাদের দেখতে পায় না ওরা —এবার রীতিমত হতভম্ব হয়ে পড়ে। রওশন শেখের হাতে একটা তলোয়ার ছিল। ভেবাচাকা খেয়ে একটা মাটির চাঙড়ে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায় সে। সঙ্গে সঙ্গে তার ঠ্যাঙে এক কোপ দিয়ে বাদলকে ধরে নামাই পুকুরের-খোলে। এক মুহূর্ত দেরি করিনি। কাজ সেরে সরে যাই। রওশন ঠ্যাং খুইয়ে বেঁচে আছে। ওর একার সাক্ষীতেই এই যাবজ্জীবন। আপনাদের দলের মোজাম্মেল হক আমাদের দুঃখের কথা শুনে বিনা পয়সায় হাইকোর্টে পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল। তার দয়াতেই বেঁচে আছি। না হলে ফাঁসি হয়ে যেত।

পাপ-পুণ্য দোষী-নির্দোষ ন্যায়-অন্যায় শব্দগুলি আজকাল রীতিমত

তালগোল পাকায় শতদ্রুর মাথায়। এর মধ্যে দিয়ে অন্ধের হস্তিদর্শন হয় মাত্র। সত্যকে জানতে হলে—পুরোটাকে জানা দরকার।

॥ ১৩ ॥

প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ চাষবাসের কাজকর্ম হয়ে যাবার পর ছুটে আসে শহরের বুকে। একটু-ফ্যান এক-মুঠো ভাতের আশায়। লজ্জা-শরম ত্যাগ করে হাত বাড়ায় পথচারীদের সামনে। বাস্তুচ্যুত গায়ে-গতরে-খাটা লোকজন শহরের রাস্তার পাশে আস্তানা বানায়। কাজের আশায় পাগলের মত ছুটে বেড়ায়। জোতদারদের কাছে জমে-থাকা-জমি এই কাজ-জানা মানুষগুলোকে দিলে—গুরুতর একটা সমস্যার সমাধান হয়। ভূমি-সংস্কার আইনটা তো তৈরি হয়েছে এই কারণেই। তার সুফলটা পাচ্ছে না মানুষ। জেলখানায় ভবদেব মোড়লের কাছে সাঁওতাল কৃষকদের জীবন-পণ লড়াইয়ের কথা শুনেছে শতদ্রু। এই লড়াইয়ে নারী-পুরুষ আজ একাট্টা। টাকা-দিয়ে-পোষা জোতদারের ভাড়াটিয়া বাহিনীকে সমানে পযুর্দস্ত করে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। দখল রেখে জমি চাষ করছে। দলবল নিয়ে ফসল কাটছে। তীর-কাঁড়-লাঠির ঘায়ে মাঝে মাঝে রক্তাক্ত-বীরের-মৃত্যু বরণ করছে অনেকে। জমির দখল কেউ ছাড়ছে না। জোতদার-বাহিনীর কাছে আক্রান্ত হলে তীরের সঙ্গে 'কেঁদপাতা-পান্তাভাত' পাঠিয়ে দিচ্ছে আশপাশের জঙ্গল-মহল্লায়। সাংকেতিক-সংবাদ পেয়ে কাতারে-কাতারে ছুটে আসছে লড়াকু-বাহিনী।

উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ভবদেববাবু। আদিবাসী এলাকায় সারাদিন সাইকেল চেপে ঘুরে বেড়ান। সঙ্গে নেন সাঁওতাল মহিলা চুম্‌কিকে। ভবদেবের সঙ্গে থেকে চুম্‌কির ভেতর-বার দু'দিকেই রূপান্তর ঘটেছে। ভবদেববাবুর বাবা ডাক্তার আনন্দময় এসেছিলেন আদর্শের তাগিদে অরণ্যের অধিবাসীদের সেবা করতে আর ভবদেববাবু রোগীর নাড়িতে হাত না দিয়ে সমাজের রোগ নির্ণয়ে তৎপর। পাশাপাশি বসবাস করার সময় চুম্‌কিদের পরিবারের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মণ্ডল-পরিবারের হাওয়ার-ছিটেফোঁটা জড়িয়ে যায় চুম্‌কিদের পরিবারে। তাই হাব-ভাব-আচার-আচরণের পরিবর্তন সহজেই চোখে পড়ে। ভবদেববাবু ভিন্ন-এলাকার শিক্ষাপ্রাপ্ত সাঁওতাল পল্লীতে নিয়ে যায়

তার প্রতিবেশীদের। আনন্দময়বাবু হাসেন একমাত্র সন্তানের এই কর্ম-তৎপরতায়। বিশ্বাস এনে পরিবর্তন ঘটাতে হবে এই সমাজের মধ্যে।

কৃষকদের আন্দোলনমুখী মনোভাবকে অন্যদিকে সরিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে ঘুঘু জোতদাররা। পথ তৈরি করার জন্যে সবাই একসঙ্গে বসে। নানা ধরনের প্রস্তাব আসে। খুন-জখম থেকে শুরু করে কোন কিছু বাদ যায় না। শেষ পর্যন্ত জোতদার ক্ষুদিরাম চক্রবর্তী বলে, ভবদেবের বদনাম রটাও চুম্‌কিকে জড়িয়ে। কায়দা করে সাঁওতাল মহলে ঢুকিয়ে দাও সে কথা। কয়েকজনকে হাত-কর। শালা নেতা ধাক্কা খেলে—আপ্‌সে সবাই ভেগে যাবে এই রাস্তা থেকে।

কথা মত কাজ চলে। ব্যাস ! কিস্তি মাত হয়ে যায়। রাস্তা-ঘাটে-হাটে-বাজারে কথা ওঠে। এরপর থেকে সবাই সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকায় ভবদেব আর চুম্‌কির দিকে। প্রস্তাব আসে চুম্‌কিকে ভবদেবের সঙ্গে মিশতে দেওয়া যাবে না।

দীর্ঘদিন লড়াইয়ের ময়দানে পোড়-খাওয়া কর্মীরা বলে, তা কি করে সম্ভব ? এতবড় একটা আন্দোলন চলছে। চুম্‌কি এসব ব্যাপারে স্যানসট্র হয়ে পড়েছে। অনেক কাজ হচ্ছে ওকে দিয়ে। সেবার ভবদেববাবু উপস্থিত ছিলেন না—চুম্‌কি মিটিংটা চালিয়ে দিল। সবাই বেশ সন্তুষ্ট হলো। আজকাল ও বেশ বুঝিয়ে বলতে পারে। ওকে হটালে কি হবে ? ওরকম কাজের লোক ক'টা তৈরি হয়েছে ?

সোমরা আর কাঁদু গলার স্বর চড়িয়ে চিৎকার করে ওঠে, তাহলে ভবদেবের সঙ্গে চুম্‌কির মাখামাখি কাণ্ড চলবে ?

মাখামাখি মানে কি ?

কখনো সাইকেলের পেছনে কখনো সামনের ডাণ্ডায় চড়িয়ে ফুসুর-ফুসুর গুজুর-গুজুর করাটা কি ?

আরো অনেকে তো যাচ্ছে আজকাল।

খারাপ দেখিচি তাই বলচি আমরা। আরো পাঁচজন বলচে। কার মুখে হাত চাপা দেবে ? সোমরা চেঁচায়।

ভবদেব পাশেই ছিল। বেশ জোরের সঙ্গে বলে, চাষীদের আন্দোলনে চুম্‌কির দরকার আছে। ওকে দিয়ে কাজ করাতে হবে। ওকে ছেড়ে দেওয়া মানে—আন্দোলনের বুকে ছুরি মারা।

আমরা ছুরি মারতে চাই না—তুমিই ছুরি মারতে চাইছ।

আমি?

হাঁ। আমাদের সমাজের নিয়ম-কানুন ভেঙে যা ইচ্ছা করছ তুমি। আমাদের ঘরের মেয়ে নিয়ে দিনরাত বেলেল্লাপনা করে বেড়াচ্ছ। তোমার আন্দোলনের উপর যদি এত টান তাহলে—সেই আন্দোলনের স্বার্থে বিয়ে করে নাও চুমকিকে। তখন আমরা কেউ কিছু বলবো না।

সভায় উপস্থিত চুমকি ঘামতে থাকে। মাঝে মাঝে ভবদেবের দিকে মুখ তুলে তাকায়। কিছুক্ষণ হেঁট হয়ে থাকার পর মাথা তোলে ভবদেব। বলে, বিয়ে হবে। দিন ঠিক কর। সবাইকে বল। তোমাদের উপস্থিত থেকেই বিয়ের কাজকর্ম করতে হবে। আমি কাউকে ছাড়ব না।

ভবদেব শতদ্রুকে বলেছিল, চুমকিকে বিয়ে করে আমি খুবই শান্তি পেয়েছি। কর্ম-সঙ্গী। একই আদর্শ নিয়ে পথ চলি। আমার বাবার দু'চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়েছিল আনন্দে। প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করেছিলেন তিনি।

সবিতাকে এই কাহিনী শোনায় শতদ্রু। সবিতা স্থির দৃষ্টিতে তাকায় শতদ্রুর দিকে। বলে, এর মধ্যে দিয়ে তুমি কী কিছু বলছো আমায়?

বলছি।

না। এখনো বলার সময় হয়নি।

শতদ্রু বলে, বলার সময় এলে তাহলে তুমি আমায় সজাগ করে দিও।

এ কথার কোন জবাব দেয় না সবিতা। শুধু বলে, জমি ব্যাপারে কোথা বসা হবে?

কলকাতায় একটা জায়গা ঠিক করা হয়েছে। কয়েক ঘণ্টার জন্যে বসা হবে। কথাবার্তা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

শেষ পর্যন্ত কী হবে বলে মনে হয়?

শচীপতিবাবুর মা কিছু জমি পেলেই সন্তুষ্ট। একটা মোটা-অঙ্কের টাকা পাবে তো—ক্ষতিপূরণ হিসেবে।

সেদিন আলিপুরে কোর্টের কাজ শেষ করে দুপুরটা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে কাটায় শতদ্রু। হাজরার মোড়ে এসে বি. এ পরীক্ষার রেজাল্ট আউটের খবর পায়। সঙ্গে রোল নম্বরটা আছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়। দুরু-দুরু বুকে বুকলেটের পাতায় মন দেয়। হাঁ। পাশ হয়েছে। তবে নম্বর

খুব একটা ভাল নয়। বেশ কয়েকবার নম্বরটার ওপর চোখ বোলায়। না। ঠিকই আছে। পকেট থেকে টাকা বার করতে যাচ্ছে—পিছন থেকে হাতটা ধরে ফেলে অতনু। বলে, ওটা আজ আমি দোবো।

সহাস্যে বলে শতদ্রু, খারাপ ফলের জন্যে ব্যয় করবে তুমি ?

অঙ্কের হিসেবে ও-ফলের ভাল মন্দ বিচার করা যাবে না শতদ্রু! আমি শুধু এইটুকুই জানি—এটা তোমার জীবনে অমূল্য সম্পদ। অজস্র কাজের ফাঁকে ফাঁকে কয়েক বছর ধরে যে সঞ্চয় তুমি করেছো তার মূল্য অনেক।

শতদ্রুকে নিজেদের বাড়ি টেনে আনে অতনু। বাজপেয়ী বংশের একমাত্র সন্তান সে। বাবার বিরাট ব্যবসায়-বাণিজ্যের অর্থের-উপার্জনের ছাপ প্রতিটি জিনিসপত্রে। আলিপুরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে চকমিলান-প্রাসাদ। ঠাকুর-ঝি-চাকর-দারোয়ান-ড্রাইভার-মালি নিয়ে সংসার। শতদ্রু বিস্মিত হয় এদের প্রাচুর্য দেখে। একসময় অতনুর বাবা আসেন। বলেন, সবাই আমায় ভয় দেখিয়ে গিয়েছিল—আমাদের গ্রামের পুরাতন বাড়িঘর সব নাকি তুমি নিজের নামে রেকর্ড করিয়ে নেবে! খবর নিয়ে দেখলাম—আমাদের নামেই সব রেকর্ড হয়েছে। এতেই ভাল করে চিনে নিলাম তোমাকে। তোমার ঠাকুর্দাকে আমার পূর্বপুরুষ জেনেশুনেই আশ্রয় দিয়েছিলেন। তুমি তাদের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। আমি বাবা ব্যবসায়ী। লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ দেখেই মানুষের ভাল-মন্দ বিচার করি। অন্য কোন মাপকাঠি নেই আমার।

অতনুর মাথা নীচু হয়।

শতদ্রু ধীরে ধীরে বলে, আমরা আপনাদের প্রজা নয়—আশ্রিত। এটা চিরকাল মনে থাকবে।

বাবা চলে যাবার পর অতনু বলে, কষ্ট পেলি শতদ্রু ?

এতে কষ্ট পাবার কি আছে? সত্য কথাটা অকপটে বলেছেন উনি। অনেকক্ষণ এখানে কাটিয়েছি। এবার বরং আমাকে একটু এগিয়ে দিবি চল।

অতনুর মা ঘরে ঢোকেন। ফল আর খাবার ভরা থালা নিয়ে আসে কয়েকজন। শতদ্রুর চোখ কপালে ওঠে থালা সাজাবার বহর দেখে।

আমি এখন—

খেতে পারবো না—এই তো? সেটি হবে না। এই আমি বসলুম। অতনুর মা বসে পড়েন। সামনের টেবিলে খাবার রেখে চলে যায় কাজের-মেয়েরা।

অতনুর মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে শতদ্রু।

শতদ্রুর মা বলেন, কি দেখছো? আমি কনৌজের মেয়ে নয়। একেবারে এদেশের। সবিতার দূরসম্পর্কের মাসি হই। অতনুর বাবা পছন্দ করেই ঘরে তুলেছিলেন আমাকে। ওঁদের বংশে কেউ এখানকার মেয়ে বিয়ে করেননি।

অতনুর বাবা ঘরে ঢোকেন। বলেন, আমার ইচ্ছা—

থাক্ তোমাকে এখন ইচ্ছা প্রকাশ করতে হবে না।

ওঁকে বলতে দিন না মাসীমা।

ঠিক বলেছ বাবা। ইচ্ছা চেপে রাখা উচিৎ নয়। প্রকাশ হওয়া উচিৎ।

আমি চাইছিলাম তোমাদের জন্যে একটা বাড়ি করে দিই। এ ব্যাপারে আমাদের দায়িত্বও তো আছে।

না মেসোমশায়। যেখানে আছি—ওখানে আর কিছুদিন থাকতে দিন। আপনাদের আশীর্বাদ থাকলে—তাড়াতাড়ি একটা কুঁড়ে বেঁধে নিতে পারবো।

এতে অমত করছো কেন বাবা? তোমাকে দিয়ে কি আমাদের কম আনন্দ। বলেন অতনুর মা।

ঠিক আছে, চিন্তাভাবনা করে—বাবার সঙ্গে কথা বলে আপনাকে জানাব। খেতে খেতে ধীর কণ্ঠে বলে শতদ্রু।

অতনু শতদ্রুর দিকে আড়চোখে তাকায়।

আজ দেরি না করে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসে শতদ্রু।

এবারও সবিতাদের বাড়ি থেকে মিষ্টান্ন আসে।

কিন্তু কয়েকদিন সবিতা আসছে না। শতদ্রু একাই কাজকর্ম চালিয়ে যায়। কলকাতায় বসা হয়ে গেছে। পঞ্চাশ বিঘা জমি শচীপতিবাবুদের খাসে ছেড়ে দিলে তারা বাকি জমিতে চাষীদের প্রজা স্বীকার করে নেবেন। শচীপতিবাবুরা ভবানীবাবুদের সঙ্গে বসেও একটা নিষ্পত্তি করে ফেলেছেন। শ্যামগঞ্জের-বাজার দশ বিঘা জমি আর কিছু টাকা পেয়ে ভবানীবাবুরা মামলা তুলে নেবেন।

এ্যাটেস্টশান ক্যাম্পে একটা-সোলেনামায় পুরো জমির মামলা নিষ্পত্তি হবে। শতদ্রু রাতদিন খাটতে শুরু করে রেকর্ডের কপি আর কাগজপত্র নিয়ে। দু'পক্ষের উকিল বসে সোলেনামা লেখা হয়। প্রত্যেকটি চাষীর অধীনে কোন্ কোন্ খতিয়ানের জমি রেকর্ড হবে, শচীপতিবাবুদের নাম

বরাবর কোন্ কোন্ জমি রেকর্ড হবে সমস্ত এই সোলেনামায় লেখা থাকবে। কাজ প্রায় শেষ হওয়ার মুখে একদিন শতদ্রু বলে, কচিরামদা সবিতা আসছে না তো?

আসবে আসবে। এবার পাকা ব্যবস্থা করে তবে আসবে। মুচকি হেসে কথাগুলি বলে কচিরাম।

পঞ্চু মোড়ল বলে, কচিরামদা এখন ঘটকালী করচে—

তাই—নাকি?

হাঁ। মা-ঠাকুরমাকে রাজী করে ফেলেচে। একটা জায়গায় আটকে গেছে। সোলেনামা হয়ে গেলে ঝামেলা চুকেবুকে যাবে। ব্যাস! ফাল্গুনেই শুভ কাজটা হয়ে যাবে।

শতদ্রু বিস্ময়ে তাকায় কচিরামের মুখের দিকে। কচিরাম কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলে, আমাদের জন্যে যাঁরা জীবন-যৌবন বিসর্জন দিতে রাজী—তাদের জন্যে আমাদেরও কিছু করার আছে দাদু। চোখের জল ধরে রাখতে পারে না কচিরাম। ঝরঝর করে ঝরে পড়ে। শতদ্রু সবুজ গাছপালার ফাঁক দিয়ে নদীর স্রোতে ভাসা একটা পাল তোলা নৌকোর দিকে তাকিয়ে থাকে। কচিরাম বলে যায়, পঞ্চুর তিন বিঘের মাথায় যে ডাঙা জমিটা আছে। অনেক পলাশ গাছ থাকার জন্যে জমিটাকে লোকে বলে পলাশডাঙা। ওখানে একটা কুঁড়ে বেঁধে দিতে চাই আমরা। মা-ঠাকুরমার ইচ্ছা—নতুন সোনালী রঙের খড় দিয়ে ছাওয়া হবে ঘরখানা। এর দরুন যে টাকা খরচা হবে সব শোধ করবে তুমি। রাঙামাটি স্কুলে লাগবে আগামী ইংরাজী মাসের প্রথম তারিখ থেকে। টাকা শোধ দিতে অসুবিধে হবে না। হারানদের পাকা কাঁঠাল গাছের তক্তা হবে। আমার নিম কাঠের গবরাট। টেবিল-চেয়ার তৈরি হবে পুরানো জাম কাঠে।

বাড়ি এসে শতদ্রু একই ধরনের কথা শোনে। জ্ঞানদাময়ী বলেন, আমার শরীর খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে ভাই। শেষ ইচ্ছেটা পূরণ করে তবে পৃথিবী থেকে যাবো। আমি গোরাচাঁদ চক্রবর্তীকে কথা দিইচি—সবিতাকে ঘরে আনব। গোরাচাঁদের বয়সের তুলনায় শরীরটা বেশ খারাপ হয়ে গেছে। সারাটা জীবন অমানুষিক পরিশ্রম—তার ওপর দুশ্চিন্তা। ঘুণ ধরে গেছে শরীরখানায়। এ অবস্থাতেও বুড়ো-হাড়ে যৌবন ফিরে এসেছে। চাষ করার জমিটুকু ফেরৎ পাবে এই আশায়। সেদিন সারাটা দুপুর আমার পাশে

বসেছিল গোরাচাঁদ। বলে গেল তার জীবনের কথা। আমাদের মতই আঘাত-খাওয়া জীবন তার। চন্দ্রমাধব আয়ঙ্গির সেরেস্তায় কাজ করতো সে। গরীব এক কৃষকের জন্যে—সত্যি কথা বলার দায়ে তার চাকরি যায়। চন্দ্রমাধববাবু ঘোষণা করে দেন—কেউ যেন তাকে চাকরি না দেয়। গোরাচাঁদ নিমক-হারাম। ধোপা নাপিত বন্ধ করতেই শুধু বাকি রাখে তার। স্ত্রীপুত্র পরিবারের জীবন বাঁচাবার জন্যে শেষ সম্বল স্ত্রীর হাতের বালা-জোড়া বিক্রী করে—ভবানী বাড়ুজ্যের কাছ থেকে অগ্রিম-জমায় জমি নিয়ে, চাষ আবাদ শুরু করে। প্রথম প্রথম হৈ-চৈ শুরু হয়ে যায়। বামুন-চাষা লাঙল চালায়। এ সব কথা গ্রাহ্য করে না গোরাচাঁদ। শক্ত মন নিয়ে মাঠে নামে। পবিত্র-জীবন বাঁচাবার জন্যে যে শ্রম—তা আরো পবিত্র। শতদ্রু কোন কথা বলে না। তার চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জলের ফোঁটা পড়তে থাকে।

লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ায় শতদ্রু। এক অদৃশ্য শক্তি তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে! আরো একটা জিনিস বিশেষ ভাবে অনুভব করে সে—ঠিক যে সময়টিতে সবিতার কাছে ধরা দেবার জন্যে তার হৃদয় উন্মুখ হয়ে আছে—সেই পরম মুহূর্তে জ্ঞানদাময়ী তার হৃদয়ের কথা আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। পূর্বসূরীর এই জ্বলন্ত আশীর্বাদ শতদ্রুর চোখের সামনে ভেসে ওঠে দৃপ্ত হয়ে। নতমস্তকে সে তা মেনে নেয়।

পলাশডাঙায় ঘনঘন 'জাব' তৈরি হয় আর মাটির দেয়ালের মোটা 'পাট' ওঠে। কয়েক পাটেই জানালা-বন্দী হয়ে দেয়াল শেষ হয়। পাশের গ্রাম থেকে 'দেলি' আনা হয়। মাটির দেয়াল দিতে ওদের জুড়ি নেই। হামিদ সেখ আর ইউসুফ মল্লিক। রাজমিস্ত্রীর-ওলন-ফেলা কাজ ওদের। মাটির 'পাট' ঠিক মত না হলে 'চাপ' ফেলে দেয় ওরা। গালিগালাজ করে। শালা ফাঁকি মেরে মাটি মাড়িয়েচ। দু'কোশ দূরে দূরে কোদাল চালিয়েচ। ই দেশে জলের অভাব আছে রে শালা। আমার কাজের জাবে আর হাত দিবিনি।

পলাশডাঙায় মেলা বসে যায় যেন। চাষীরা তদ্বির-তদারক করে। কাজ-কর্ম দেখে। গ্রামে খোঁজাখুঁজি করে পাঁচ-ছ সনের বাঁশ আসে। তালকাঠ চেরাই করে নেয়—খয়েরের মত রঙ। অন্য গাছ চেরাই হয়ে কাঁচিরামের বিস্তৃত উঠোনে পড়ে। জানালা কপাট তৈরি হয়।

পাঁচিল দিয়ে ঘেরা দু-কামরা মাটির ঘর। চওড়া দাওয়া। অনেকখানি জায়গা নিয়ে শোবার ঘরের লাগোয়া রান্নাঘর। জাবখানা থেকে আর কিছু

মাটি তুলে নিলে সামনের বর্ষাতেই পুকুর হয়ে যাবে। আগে থেকে ঘাট-তৈরি করার বন্দোবস্ত হয়েছে। ঘাটে ইটের কাজ হবে।

সেদিন সর্বাণী নতুন বাড়ি কেমন হচ্ছে দেখতে আসেন। সব কিছু দেখে আনন্দে তার চোখের তারা ডগমগিয়ে ওঠে। 'নিজেদের বাড়ি-ঘর।' কথাটা ভাবতেই পারতেন না এতদিন। শতদ্রু বড় হলে একদিন নিশ্চয় বাড়ি-ঘর হবে। এটা স্বপ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আজ সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেতে চলেছে। রাঙামাটি স্কুলে কাজ করার ব্যাপারটাও পাকাপাকি হয়ে গেছে। আপাততঃ মাসে পঞ্চাশ টাকা দেবে ওরা। তা দিক। তাদের পরিবারে এক বিরাট পরিবর্তন এটা। আমূল পরিবর্তন বলা যায়। আনন্দে সর্বাণীর চোখ ফেটে জল আসে। পলাশডাঙার মাটি মাথায় ঠেকান।

এত তাড়াতাড়ি একখানা বাড়ি তৈরি হয়ে যাবে ভাবতেই পারে না অবিনাশ ঘোষাল। তাছাড়া 'টৌনি-সারদের' এই বাড়বাড়ন্ত অবস্থা তার গায়ে যেন তাতা-লোহার ছ্যাঁকা দেয়। সেদিন গোধূলি বেলায় পলাশডাঙার পাশ দিয়ে যাবার পথে নতুন দেয়াল দিয়ে প্রায় তৈরি হয়ে আসা বাড়িখানা দেখে—স্বগতোক্তি করেন অবিনাশ ঘোষাল, এত কম 'পানার—' দেয়াল? ঘরের মাপ অবশ্য খুব খারাপ নয়! দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরের রাজা। ঢাঁটায়ে দক্ষিণে বাতাস আসবে। সামনে ফাঁকা মাঠ। শালার ভাগ্যটা দেখছি নেহাৎ জবরদস্ত! যাকে বলে পাতা-চাপা-কপাল। শেষ অব্দি টেনে-হিঁচড়ে ঠিক নিজের কোলে ঝোল টানলো। এতেই সন্তুষ্ট হলি বাবা? আরো-আরো অনেক পাওয়া উচিৎ ছিল। সাধে কি বলে, চাষা কি বোঝে ব্রাণ্ডির স্বাদ?

অবিনাশ ঘোষালের সঙ্গে ছিল কানন দেউটি। এদিক ওদিক তাকিয়ে সে বলে, তাড়াতাড়ি পা চালান ঠাকুরমশাই। কে কোথায় আছে—ওরা দেখে ফেলবে।

দেখলো তো বয়েই গেল। রাস্তার ধারে বাড়ি করচে। পথ চলতে মানুষ তাকাবে না তার দিকে?

কানন বোঝাতে পারে না—কেন সে তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যেতে চায়।

ডাঙার এক কোণে পঞ্চুর সঙ্গে কথা বলছিল কচিরাম। দেয়াল-ঘেরা উঠোনের দক্ষিণ সীমানায় কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে দেখে এগিয়ে আসে। অন্ধকারটা জমাট বেঁধেছে ইতিমধ্যে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না কাউকে। দু'জনে

কাছাকাছি এসে বলে, কে ? কে আপনারা ?

আমি অবিনাশ। পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম। থেমে গেলুম। এমন ঝড়ের মত কে বাড়ি তৈরি করছে হে ?

শতদ্রু দা-ঠাকুর। বলে কচিরাম।

পঞ্চুমোড়ল হাত যোড় করে বলে, এখানে আপনাকে বসতে দেবার মত কিছু নেই প্রভু !

ওই হোল হে হোল। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন অবিনাশবাবু, বেশ অন্ধকার হয়ে গেল। চল হে কানন।

সুমুখ-অন্ধকারের সময় আলো নিয়ে বেরোতে হয় ঠাকুরমশাই।

একটু দূরে চলে গেলে কচিরাম বলে, নাক-লজ্জার মাথা খেয়েছে শয়তানটা।

এদের আবার নাক-লজ্জা আছে নাকি ? তাছাড়া কোন ধান্দায় এসেছিল —বোঝা খুব শক্ত ! আজকাল আবার কথায় কথায় 'হে' জুড়ে দিচ্ছে শয়তানটা।

বাহারআলী মল্লিক সাদাকাশ রজ্জাক আলী রামদেও—পঞ্চু কচিরামদের সঙ্গে ঘর তৈরির ব্যাপারে একমত হয় না। বাহার মল্লিক বলে, মাঠের মাঝখানে খড়ের ছাওয়া ঘর যে কোন মুহূর্তে বিপদ ডেকে আনবে। এর থেকে কাঠের বাটাম মেরে এক নম্বর পিকিট-টালি দিয়ে ঘর ছাওয়া হবে। পাকা তাল কাঠের কাঠামো। মাঠ-গুদাম থাক্‌বে। তবেই জমকালো হবে। এর জন্যে মজুররাও টাকা তুলে দেবে। শেষ পর্যন্ত বাহার মল্লিকের কথা মেনে নিতে হয় সবাইকে।

সেদিন মিল গেটে সাদাকাশ বলে, ক'দিন কচিরামদা এমন ভাব দেখাচ্ছিল —শতদ্রু যেন শুধু মাত্র তাদের লোক। আমাদের কোন জোর নেই তার ওপর।

কচিরাম রীতিমত কোমর বেঁধেই ছিল—হাত পা নেড়ে বলে, বঙ্কিমদা কি বলতেন মনে নেই ? যাদের জোর আছে তারাই দখল করে নিতে পারে। অন্যরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বিনা জোরে কিছুই হয় না দুনিয়ায়।

বঙ্কিমদার কথা উঠতে অনেকের চোখ আজ ছলছল করে ওঠে। কিছুদিন

আগে তিনি মারা গেছেন।

শতদ্রুর মনে পড়ে যায় মৎস্যজীবী পল্লীতে তার শেষ সভার কথা। বৃদ্ধ অবস্থায় সারাদিন পায়ে হেঁটে ঘুরলেন কয়েকটা পাড়া। সব কিছু তন্ন তন্ন করে দেখলেন। এক চিলতে জায়গার ওপর গুচ্ছের-খানেক ভাঙা-চোরা-দেয়াল চাল-ভাঙা ঝুপড়ি। একখানা খুপরিতে গাদা-গাদা মেয়ে-পুরুষের অস্বাস্থ্যকর অবস্থান। শীতের রাতে ছেঁড়া-চট ভুলভুলি-কাঁথা দিয়েও কিছু হয় না। অবাধে উত্তুরে-বাতাস চলে আসে আস্তানার মধ্যে। সারা রাত চলে কাঁপুনির পালা। ঘুম আর আসে না।

অনেক বয়েস পর্যন্ত উলঙ্গ-থাকা বাচ্চারা দু'হাতে বুক জড়িয়ে হি-হি শীতে-কাপা দেহগুলি নিয়ে খোলা মাঠের আলে বসে সমবেত কণ্ঠে সূর্য দেবতার কাছে প্রার্থনা জানায়ঃ

আয় রোদ ঝেঁপে।

ধান দোবো মেপে॥

পাড়া ঘোরার পর বঙ্কিমবাবু বলেন, ভারতের অনেক প্রদেশে ঘুরে দারিদ্র্যের বীভৎস চেহারা দেখেছি। পশ্চিম বাংলাতেও তার চেহারা একই ধরনের। এদের দুঃখ দেখে যাদের বুক মোচড়-খায় একমাত্র সেই দায়িত্বশীল কর্মীরাই কিছু করতে পারে এদের জন্যে। শতদ্রু, বড় কঠিন এ কাজ।

খোটেল-পাড়ায় একটানা চিৎকার করে কাঁদছে এক পাল মেয়ে। বাচ্চারাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ডগডগে সিঁদুর মাখা শীতলা-মনসা-দক্ষিণ-রায়ের-থানে এসেছে সবাই হৃদয়ের যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব করার জন্যে। উন্মুক্ত পরিবেশে খাঁ খাঁ রোদ্দুরের মাঝে এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন বঙ্কিমবাবু। তিনি বলেন, ব্যাপার কি শতদ্রু?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শতদ্রু বলে, সাগরদ্বীপ জম্বুদ্বীপে দাঁড়টানা নৌকো নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল এদের বাড়ির পুরুষেরা। ঘূর্ণিঝড়ে সমুদ্রে সবার সলিল সমাধি হয়েছে।

ভবতারণ বারিক বলেন, হিজলী কাঁথিতে বাবা সাহেবের দরগায় পুজো দিয়ে গেছে ওরা। কাঁটাবেড়েতে মা বিশালক্ষীর মন্দিরেও পুজো দিয়েছে। তবু কেন এমন হলো বলা যায় না। নিশ্চয় কোন খুঁত হয়েছে।

বঙ্কিমবাবু সহাস্যে ভবতারণের দিকে তাকান। বলেন, প্রায় প্রতি বছর এমনি ভাবে মৎস্যজীবীরা মারা যাচ্ছে—দেবতা অসন্তুষ্ট হয়েছে বলে নয়

ভাই। প্রকৃতির সঙ্গে কী কায়দায় যুদ্ধ করতে হবে। সেই কায়দাটি আমরা এখনো শিখে উঠতে পারিনি। যখন কায়দা শিখে যাবো তখন আর কেউ মরবে না।

কথাবার্তা শেষে কিছুক্ষণ পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকেন বঙ্কিমবাবু। গোবিন্দ ধাড়া গোপাল পাখিড়া জীতেন শাসমল ছুটে আসে বঙ্কিমবাবুর কাছে। বগলা গুহ কদিন ঘুরে বেড়াচ্ছেন মৎস্যজীবী পল্লীতে। এই সময় অসহায় মৎস্যজীবীদের জন্যে কি করা যায় সে সম্পর্কে কথাবার্তা বলছেন পাড়ার মোড়ল মাতব্বরদের সঙ্গে। নদীর বাঁধের নীচে বটগাছের ছায়ায় একখানা শতছিন্ন চট পাতা। ওখানেই বসে আছে পাড়ার লোকজন। পাশে নদীর চরে সারি সারি ডিঙি নৌকো বাঁধা। সারাই হচ্ছে কয়েকটা নৌকো।— উপুড় করে কিংবা স্বাভাবিক অবস্থায়। ঢেউয়ের দোলনায় দুলছে ভাসমান কয়েকটা জেলে ডিঙি। খোলের জল ছেঁচে দাঁড়ের দড়িতে জল ছিটিয়ে দিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে কয়েকখানা পাড়ি দেবার জন্যে।

বঙ্কিমবাবু এখানে এসে উপস্থিত হলে বগলাবাবু বলেন, শতদ্রুকেও এ কাজে হাত দিতে হবে। মৎস্যমন্ত্রীর কাছে একটা ডেপুটেশান দেওয়া দরকার। ক্ষয়রাতি-সাহায্য ঋণ চাওয়া প্রয়োজন। তার জন্যে কাগজ পত্র তৈরি করতে হবে তাড়াতাড়ি। বঙ্কিমবাবু সস্নেহে তাকিয়ে থাকেন শতদ্রুর দিকে। এর অর্থ কি সবাই বুঝে নেয়। দুলাল ব্যানার্জী চেঁচিয়ে ওঠেন, লেগে যাও। আমরাও সঙ্গে আছি।

বগলাবাবু সবাইকে বোঝান সমাজ-ব্যবস্থার পুরো পরিবর্তন করা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার কথা। এই পথে কাজ করতে গেলে একটা পদ্ধতি মেনে চলতে হবে সবাইকে! ছটফট করতে করতে এলোপাথাড়ি কিছু করলে হবে না ভাই। মায়েদের মত ধৈর্য আর ভালবাসা নিয়ে পথ চলতে হবে আমাদের। অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে হাজার রকমের কুসংস্কার দীর্ঘদিন জমাট বেঁধে আছে। তাতে এতটুকু ঘা লাগলে চিৎকার করে উঠবে—সমাজের বর্তমান কর্তা ব্যক্তিরা। তাই সব কিছু জেনে-বুঝে—ওদের মনের কাছাকাছি এসে কাজকর্ম করতে হবে। রাতারাতি খোল-নলচে বদল করা সম্ভব নয়। তবে একথাও ঠিক—বর্তমান ব্যবস্থার ঘূর্ণাবর্তে পড়ে এরা পাক খাচ্ছে দিনের পর দিন। এই অবস্থার হাত থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এদের তুলে আনতেই হবে।

বঙ্কিমবাবু আজ খুব ধীর গলায় বলেন, এখন ভোট নিয়ে বিধান সভায়

লোকসভায় যাচ্ছি আমরা। জানি না শেষ পর্যন্ত কি হবে! কিন্তু একটা চিন্তা-ভাবনা নিয়ে যখন ঢুকেছি তখন এর সব কটা স্তরে ঢুকে পড়তে হবে। সেখানে থেকেও তো কিছু ভাবা যায়। এখন আরো একটা কাজ করতে হবে। যারা চিন্তা-ভাবনায় কিছুটা অগ্রণী, মানুষের জন্যে যাদের দরদ ভালবাসা আছে—তাদের কাজে লাগাতে হবে। এখন খুঁজে পেতে কর্মীদের বার কর। কাজে লাগাও। এ বড় কঠিন কাজ। এখানে যারা আছেন—দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা দিয়ে, তারা একাজ করতে পারবেন। এ বিশ্বাস আমার আছে। এ ছাড়া এখন অন্য কোন পথ নেই।

পদ্মা বেজ মেয়েদের মধ্যে রীতিমত চালাক-চৌকস। রীতিমত রসিয়ে রসিয়ে বলে সে, আমাদের সুবিধে কি করে হবে বলুন? পেটে আমাদের পিলে ঢুকে আছে। পাঁচ বছর আগে পাঁচিশ টাকা ধার নিয়ে আমি মাছের ব্যবসায় নেমেছি। স্বামী ঘূর্ণিঝড়ে মারা যাবার পর থেকে। মাসে মাসে সুদ মিট্রে দিয়েও আসল টাকা শোধ কত্তে পাচ্চিনি। দিনরাত খেটে নিজের পোড়াপেটে দু'মুঠো দিই, বাকি সব ঢালি মহাজনের ছি-চরণে। এতে আমাদের আর কি হবে বলুন? জাল-নৈকো কেনার জন্যে এ পাড়ার যারা টাকা-কড়ি ধার নিয়েচে—তাদের ঘর বাড়ি জাল-নৈকো জমি-জিরেত মায় গরু-বাছুর পর্যন্ত বন্ধক আছে মহাজনের কাছে। বাপের দেনা বেটার ঘাড়ে চাপবে। যারা সমুদ্রে ডুবে মরলো—তাদের ঘরবাড়ি বাস্তুভিটে গরু-বাছুর আগেই মহাজনের কাছে বন্ধক রেখে তবে বেরুতে পেরেছিল। না হলে অত টাকা পাবে কোথা? পদ্মর-দু'চোখ দিয়ে হু-হু করে জল গড়িয়ে আসে। শতদ্রু আড় চোখে তাকিয়ে দেখে, বঙ্কিমবাবুর দু'চোখ জলে ভরে যায়। শতদ্রু অন্য দিকে চোখ ঘোরায়। কোঁচার কাপড় দিয়ে চোখ মোছে।

মৎস্যজীবী পল্লীর সভার শান্ত সংযত কথাবার্তা মুগ্ধ করেছিল সবাইকে। বঙ্কিমবাবুর বলার সময় কেউ টু-শব্দটি করে না। রূপকথার গল্প শোনার মত সবাই কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়ে। বঙ্কিমবাবু বলে যান, সভ্যদেশের মৎস্যজীবীরা ভাল জামা প্যাণ্ট পরা—পায়ে জুতো মোজা পরে ট্রলারে চেপে শক্ত সুন্দর জাল দিয়ে নীল সাগরের জলে মাছ ধরে। মাছে জাহাজের-খোল ভর্তি হয়ে গেলে বন্দরে চলে আসে ট্রলার। বাঁশি বাজিয়ে জেটিতে ভিড়ে যায়। মাছ নামিয়ে দেয়। মাছে বরফ দিয়ে পাঠান হয় দূরে দূরে। মাছ নষ্ট হয় না। ভাল রোজগার করে মৎস্যজীবীরা। এদের বাড়ির

ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। আমাদের দেশের ব্যবস্থাটা পুরোপুরি আলাদা। এখানে সব কিছু হয় বড়লোকের স্বার্থ রক্ষা করার জন্যে। পড়াশোনার নামগন্ধ নেই। গরীবরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে। অকালে দুর্বিপাকে জীবন খোয়ায়। এদের দেখার কেউ নেই। এখানকার ইতিহাস থেকেই জানলুম—বছর বছর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায় যারা—তাদের অনেকেই মাঝে মাঝে বেঘোরে জীবন হারায়। মানুষের খাবার খুঁজে আনে যারা অশান্ত সমুদ্রের আবর্ত-গর্ভ থেকে, তাদের এভাবে অকালমৃত্যু স্বীকার করে নেওয়া যায় না। বড়লোকদের স্বার্থরক্ষা করা সমাজ-ব্যবস্থায় এটা হচ্ছে। বছরের পর বছর। একটা গা-সওয়া অনিবার্য ব্যাপার যেন। কিন্তু এভাবে একে দেখলে হবে না। এই ধাঁচের সমাজ-ব্যবস্থাকে ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে। শুরু করতে হবে সেই লড়াই। আপনাদের নিয়েই নামতে হবে সেই লড়াইয়ে। তার আগে আরো একটা কাজ করতে হবে। মহাজন বিষ্টুবাবুর কাছে দল বেঁধে যেতে হবে। প্রত্যেকের হিসাব নিকাশ দেখে নিতে হবে। ভুল হিসাবের প্রতিবাদ করতে হবে। ওদের মনগড়া হিসাবের জালে জেলেদের চিরকাল জড়িয়ে রাখলে চলবে না। কথা শোনার পর হৈ হৈ করে ওঠে উপস্থিত মৎস্যজীবীরা।

দুর্গা ঢেঁকি বলে, শতবাবুকে এ ব্যাপারে লেগে পড়তে হবে। মজুর-চাষীদের নিয়ে যেমন দল তোয়ের হয়েচে—তেমনি দল কত্তে হবে মাছ মারাদের নিয়ে।

বগলাবাবু বলেন, শতদ্রু নিশ্চয় এটা দেখবে। আমরা এ ব্যাপারে যা যা করার সব বলে দিচ্ছি।

বিষ্টু বায়েন রীতিমত ক্ষেপে ওঠে মৎস্যজীবীদের সভা-সমিতি হওয়ার ব্যাপারে। তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বলে সে, আমার টাকাকড়ি কড়ায়-গণ্ডায় মিট্রে দে মচ্ছজীবী ছমিতি গড় না তোরা। আমার ছেলের পুত মানে আমার নাতি। আমার রক্তের দিব্য। আমার ট্যাকা—তার বাচ্চা হোল গে যা সুদ। সে সুদ আমি চাই। কড়ায় গণ্ডায় চাই। আমার হকের জিনিস—তা নিয়ে তোদের অত মাথাব্যথা কেনরে বাবু? কালে কালে হলো কি? যার ধন তার ধন নয়—। আমি বাবা বিষ্টু বায়েন। মরা চামড়ার উপরি বুলি ফুটুই। টাকা না দিলে—চামড়া তুলে নিয়ে—ঢাক তোয়ের করে বুলি বলাব। ভিকিরি

বামুনের ব্যাটা মোড়ল হয়েচে—এন্তার নোক খেপাচ্ছে রাজ্যি জুড়ে। আমার হক্কে যদি হাত পড়ে, তাহালে—স্যাকবার ঠুক্‌ঠাক কামারের এক ঘা।

ওর হাতে এম এল এ আছে। বলে নিতাই শাসমল।

দেশের মন্তীরকে হাইরে উ যখন গদি পেলে—তখুনি বলিচি সব্বোনাশ একটা হবেই। গনেশ পাখিড়ার চায়ের দোকানের সামনে বাঁশের মাচায়। জোর গলাবাজি করে বিষ্টু বায়েন। গোপাল পাখিড়া মদন মিন্দে মুখ খোলে। বলে, দেশসুদ্দু মানুষের এ্যাদ্দিন সব্বোনাশ করেচে যারা—তাদের গায়ে জ্বালা তো এখন নাগবেই। গরীব-দুঃখীরা অপ্প কথা বলতে শিকেচে—এটা ভাল নাগবে কেন?

জ্বলে ওঠে বিষ্টু বায়েন। বলে, শুনচো রাজেন—যাদের বাপ-চোদ্দ-পুরুষ আমাদের পায়ের ধুলো চেটে মানুষ তাদের ব্যাটাদের তেজ দেখেচো?

বাপ তুলে কথা বলবেনে বলতিচি—ভাল হবেনে।

ভয় কত্তে হবে নাকি?

ভয় কত্তে হবে কেন। বাপ-ঠাকুর্দা তুলে কথা না বললেই হয়।

গোপাল পাখিড়ার প্রতিবাদের পরে বেশ কয়েকজন ঝাঁঝিয়ে ওঠে। বিষ্টু চারদিকে তাকিয়ে দেখে। না যুগটা আস্তে আস্তে পাল্টাচ্ছে।

চায়ের দোকানের পাশে ঝাঁকড়া একটা অশ্বত্থ গাছ। তার আশেপাশে কেলকদম বন। ইতস্তত চারা খেজুর গাছের জঙ্গল।

চা-দোকানের সামনে বিঘে-তিন-চার খোলা ডাঙাটায় বাঁশ-মোছা মাস্তুল তৈরির কাজ চলছে প্রতি বছরের মত। হাঁকাহাঁকি শুনে কাজ ছেড়ে সবাই ছুটে আসে দোকানের সামনে। কাজের আশেপাশে বসে-থাকা ক্ষুদে দর্শকের দলও ছুটে আসে তাদের সঙ্গে। বিষ্টু চেঁচায়, বল তোমরা—ছোট বড় তোমরা সবাই বল—সেদিনের ফোচ্‌কে গোপলাটা আমার মুখে মুখে কথা বলবে?

দুরন্ত খোটেল রসিয়ে রসিয়ে বলে, পড়ন-কথা বলবেনে কেন? বলতে দোষ কি?

এ্যাঁ!

কয়েকজন এক সঙ্গে চিৎকার করে ওঠে, হাঁ।

ওঃ! মানীর মান তাহালে আজকাল আর থাক্‌বেনে?

মানীর মান অবশ্যই থাক্‌বে বায়েন মশাই, সেই সঙ্গে শয়তানদের মুখোশটাও খুলে যাবে।

বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা থাক্‌লেও—একটা কথাও বলতে পারে না বিল্টু। শুধু আকাশের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ।

পদ্ম বেজ পানের-পিক ফেলে ফিক্‌ করে হেসে ফেলে। দু'হাত তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, পরে রীতিমত গম্ভীর হয়ে ভারি গলায় বলে, কবে যে মা আমার এসবে এই পাপের রাজ্যে। উদ্ধার হবে পোড়া রাজ্যের মানুষগুনো। হে ভগীরত—মা গঙ্গাকে তুমি নেসো।

॥ ১৪ ॥

সকালে শশী মোড়লের গলা শুনে শতদ্রুর ঘুম ভেঙে যায়। ঠোঁটে-মুখে হাতের তালুর দুই পাশে অজস্র শ্বেতীর ছাপ, সারা শরীরটাকে রীতিমত বেমানান করে দিয়েছে। কিন্তু এনিয়ে আদৌ মাথা ঘামায় না শশী। উদাত্ত সুরেলা-কণ্ঠের-অধিকারী শশী প্রায় সব সময় গুণ-গুণ করে গান গায়। গান বাঁধে।

বঙ্কিম মুখার্জী ওকে খুব ভালবাসতেন। তিনি বলতেন, শশী চাঁদেরও কলঙ্ক আছে। এ নিয়ে দুঃখ করার কিছু নেই। দুঃখ-করাটা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। গুণের পরিমাণ বেড়ে গেলে—তা দিয়ে জ্যোৎস্নার বান ডাকিয়ে দাও। এটাই সবচেয়ে বড় কথা।

এ সব কথা শুনে আনন্দে নাচত শশী। বঙ্কিমবাবু তার পিঠের ওপর ডান হাতের চাপড় মারতেন। শশী সবাইকে বলতো, দেবতার আশীর্বাদ পেয়ে আমি ধন্য হয়ে গেছি। উনি কি যা তা মানুষ রে ভাই। বাইরে থেকে দেখতে যেমন উঁচু পাহাড়। মনটাও ওঁর তেমনি আকাশ ছুঁয়ে আছে। আমাদের মত মানুষের জন্যে যখন জমির আন্দোলনে নেমেছেন—গুণ্ডা বাহিনী লাঠি-সড়কি-ফারসা লোহার ডাণ্ডা পাথরের চাঙড় দিয়েও ওর কিছু করতে পারেনি।

নির্বাচনের সময় লাল টুপি মাথায় দিয়ে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে বেড়াত শশী। নিজের বাঁধা গান গাইত ঃ

> বৌবাজারে মেয়েদের ধরে—মারলো ওরা গুলি করে,
> কাকদ্বীপেতে মা অহল্যার বহাল ভাই রক্ত ধার—
> স্বদেশী সরকারের নীতি অতি চমৎকার।
> গান্ধীটুপির ভিতর থিকে বেইরে আসে রিভালবার ॥

গান শুনে কৃষক-ক্ষেতমজুর খেটে-খাওয়া গরীব মানুষ ঘন ঘন হাততালি দিয়ে চিৎকার করে উঠতো। প্রথম থেকে সভা সরগরম হয়ে থাকত। বঙ্কিম-বাবু মাঝে মাঝে বলতেন, শশী আর একটা গাও। শশী গাইত :

কুলীমজুরের হাতদুটো ভাই দুইনা গড়েছে
দুইনা গড়ে বিশ্বকম্মা—সঙ্গো গড়েচে।
বিশ্ববাসীর পেটের অন্ন,
পরণ-বসন হাজার পণ্য,
এরাই গড়েচেরে ভাই—এরাই গড়েচে॥

কৃষক সমিতির সভার সময় শশী দরাজ কণ্ঠে গায় :

উপরি আসমান—তলায় মাটি,
মাটি ছাড়া আর কি খাঁটি ?
এই মাটিরই বুকের ভেতর সোনার খনি ভাই—
ফুলের-সুভাষ রসাল-ফল তুলনা তার নাই।
এই মাটি, মাকে চুরি করে রেখেছে জোতদার
প্রাণ-ভোমরা রক্ষে কর, যুদ্ধ রে জোরদার।
এদের নিকেশ না করলে ভাই, জীবন বাঁচে না।
সুদর্শনের কাল এসেচে
(তাই) বাঁশি ছাড়ো না।
রাম রহিমের বাছারা আজ, জমি বাঁচাও ভাই
আল্লা-হরির নামেতে জোট বাঁধতে হবে তাই॥

সেদিন গভীর রাতে বিছানা থেকে ধড়ফড়িয়ে ওঠে শশী। স্ত্রী ক্ষীরোদাকে ডাকে, ও ক্ষীরো—মা সরস্বতী আমার কণ্ঠে কি দিয়েচেন শুন।

ক্ষীরোদা হাই তুলতে তুলতে উঠে বসে। চোখ কচলাতে-কচলাতে বলে, কবির নতুন কী গান বাঁধা হলো ? শুনতেই হবে আমাকে। না শুনলে আমার রক্ষে আছে নাকি ?

ও কী কথা ক্ষীরো ? ভালবেসে গান শোনাই তোকে। তুই খুশি হলে আমি হাতে সগ্গ পাই। কে কি বললে—না বললে গেরাজ্যি করিনি আমি। তোকে চাপ-দিয়ে গান শোনাই আমি ? এ কথা বলতে পারলি ? ধরাগলায় কথাগুলো বলে শশী।

ক্ষীরোদা নিজের কথার দোষ বুঝতে পারে। রীতিমত হাত জোড় করে

বলে সে, অন্যায় হয়ে গেছে ঠাকুর। মাপ করে দাও আজকের মত। ক্ষীরোদার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলে শশী। ক্ষীরোদার হাত দুটো সস্নেহে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে গান শোনায়।

গান শোনার পর ক্ষীরোদা বলে, ভোটের সময় তোমার গান শোনার জন্যে কন্যানগর পর্যন্ত হেঁটে গেনু—মনে আছে? পেরায় তিন-কোশ দূর। বাব্বা! তোমার গলার সেকী তেজ! গানের বান-বন্যে বয়ে গেল যেন।

উচ্ছ্বসিত শশী বলে, কত নোক হয়েছিল বলধিনি?

হাজার হাজার। কূল-কিনারা ছিল না। নোকের সমুন্দুর যেন। আমাদের পাড়া থিকেও নোক গেছিল শত ঠাকুরের সঙ্গে।

সকালে শশী মোড়লের শেষ কথাটা বেশ ভাল লেগেছিল শতদ্রুর। বলেছিল, দাদাঠাকুরের সঙ্গে দিদিঠাকরুণকে খুব সুন্দর দেখায়। এক্কেবারে রাধাকিষ্টের যুগল-মিলন।

বিকালে অভ্যাস মত নদীর ধারে এসে বসে শতদ্রু। ধীরে ধীরে আলোর রং ফিকে হয়ে আসে। সোলেনামা হয়ে ঐশ্বর্যগড়ের চাষীদের জমির একটা নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। হাসিমুখে সবাই জমির সীমানা-আল ঠিক করতে ব্যস্ত। চটকল শ্রমিকদের বোনাস আন্দোলন শুরু হয়েছে। কিছু লোক হাসাহাসি আরম্ভ করেছে। তারা বলছে, খাটুনির জন্যে মাইনে। বোনাস আবার কি? মালিক দেবে কেন? বড়জোর কিছু বকশিশের কথা বলা যেতে পারে। তা নয়। এক্কেবারে সেঁটে ঘা। শতকরা এত ভাগ বোনাস দিতে হবে! অনেকে উপহাস করে বলে, বোনাস পাবে না—বোনাই পাবে। এই অবস্থায় কত ধৈর্য নিয়ে নামতে হচ্ছে শ্রমিক বস্তিতে। রিক্ত-বঞ্চিত মৎস্যজীবী সম্প্রদায়। এদের অবস্থা দেখলে বুকের মধ্যে যন্ত্রণা শুরু হয়। এরাও মানুষ। এদের অধিকার আছে এই পৃথিবীতে। এই প্রত্যয় আনার জন্যে কি অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়। অন্ধকার আর কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ এদের মধ্যে আলো আনার কাজটা রীতিমত তপস্যার পর্যায়ে পড়ে।

সন্ধ্যার আবছা-অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। মাছধরা নৌকো জলে নেমে গেছে। নদীর বুকে অসংখ্য প্রদীপের শোভা। এই সৌন্দর্যের মাঝখানে অসংখ্য হৃদয়ের জ্বালা লুকিয়ে আছে। তার অনেকখানি কাছাকাছি এসেছে শতদ্রু। এদের দুঃখের অংশীদার হয়ে যন্ত্রণার ভার কিছুটা কমাতে

পারলে, তার মনের-ভার অনেকখানি কমে যাবে।

ইলিশ মাছের সময় 'জেলের কোমরে ট্যানা। পাঁজারির কানে সোনা।' পয়সা নিয়ে যারা ব্যবসায় নেমেছে—তাদের জয়জয়কার। হাড়ভাঙা-খাটুনীতে কঙ্কালকায় বেঁকে-পড়া মানুষগুলো যন্ত্রণার কূপে ছটফট করে। অকালে পরিবার-পরিজন নিয়ে শেষ হয়ে যায়।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে শতদ্রু—শনিবার-মঙ্গলবার বাবা বড় কাঁচারির থানে আর হীরাপুরে মা মনসার মন্দিরে পেট-বোঝাই পিলে—রক্তাশূন্যতা কালাজ্বর লিভারের দোষ আর হার্টের অসুখ নিয়ে কমজোর মেয়ে পুরুষেরা দল বেঁধে নৈরাশ্যভরা দৃষ্টি নিয়ে টলতে টলতে হাঁটে। যদি জীবনের সলতেটা একটু উস্কে দেন জাগ্রত দেব-দেবী! সবচেয়ে কষ্ট হয় ভূতে-পেয়েছে এই অজুহাতে রোগীদের ওপর যখন অমানুষিক দৈহিক পীড়ন আরম্ভ হয়!

আজ মনে পড়ে যায় সৌদামিনী পিসির কথা। তার কঙ্কালকায় বৌমা দীর্ঘদিন ভুগছে। সামনে এলে তার চেহারার কাঠামো দেখেই আসল রোগটা ধরতে কারো অসুবিধে হবে না। অল্পবয়েসে প্রতিবছর একটা করে ছেলে বিইয়ে মাথা গুনে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছয়। মরে-হেজে কোলে-কাঁকে গোটা-চারেক সারাক্ষণ জংলা-লতার মতো জড়িয়ে আছে আর চেঁচাচ্ছে। অবস্থা দেখে শতদ্রু মিশনারী এক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল—চিকিৎসা আর সাহায্যের ব্যাপারে। রাজী হয়েছিল তারা—হাসপাতালে যাবার একটা দিনও ঠিক হয়েছিল। দিনের-দিন সকালে গিয়ে শতদ্রু অতি-মাত্রায় উল্লসিত হয়েই বলে, খুব তাড়াতাড়ি তোমরা তৈরি হয়ে গেছ পিসি?

সৌদামিনী পিসি বিরক্তি ভরা মুখখানা বেঁকিয়ে বলে, আজ ওকে বাবার থানে নিয়ে যেতেই হবে বাবা। মন যখন টেনেচে—নিশ্চয় বাবা টেনেচে ওকে।

হনহন করে এগিয়ে চলে সৌদামিনী পিসি। বৌমা নাকি সুরে বলে, অত তাড়াতাড়ি যেউনি মা। আমি যেতে পাচ্চিনি। কোলের কাঠ-সার ছেলেটা চেঁচায়। মায়ের বুকের কাপড় খোলার চেষ্টা করে। হাত ধরে হেঁটে-যাওয়া কষ্টের। গেনর-গেনর করতে থাকে হেঁটে যাওয়া ছেলেটা। বিরক্ত মা সজোরে হাত উঠিয়ে যতদূর সম্ভব আস্তে আঘাত দেয় তার পিঠের ওপর। মুখে বলে, গেলেও বাঁচি—

এ এক জগৎ। বন্ধ-হাজার-দুয়ারীর কামরার এক একটি কক্ষ উন্মোচিত হচ্ছে আর তার মধ্যেকার রহস্য আচ্ছন্ন করছে শতদ্রুর মনকে। তার অন্তরের

অন্তস্থল থেকে আর্তনাদের ভঙ্গিতে একটা কথা সশব্দে বেরিয়ে আসছে, এখানে আলো চাই—চাই আলো—অজস্র আলো—অনেক আলো।

পিছনে পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে অজস্র মানুষ। তাদের পায়ের-আওয়াজ আর কণ্ঠস্বর এক অনবদ্য ছন্দ সৃষ্টি করে চলেছে যেন। মাঝে মাঝে টর্চের আলো পড়ছে। দ্রুতগতিতে আসছে সে আলো—চলে যাচ্ছে। ছন্দপতন ঘটে গেল হঠাৎ। উত্তরদিক থেকে একটা বড় জাহাজ আসছে। তার আলোয় তটভূমি আলোকিত।

মাথার ওপর কে হাত রাখে? পিছন ফিরে তাকায় শতদ্রু। বলে, সবিতা!

বাবাকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলুম। সারাদিন ওঁর চিকিসার ব্যবস্থা করে ফিরছি। বলে সবিতা।

উঠে দাঁড়ায় শতদ্রু। বলে, বাবাকে একা রেখে এগিয়ে এলে?

মা সঙ্গে আছেন। তাঁকে বলে একটু জোরে পা চালালুম আর-কী। দাশ পাড়ার নগেন বললো, তুমি গাছতলায় বসে আছ।

কাছাকাছি যখন এসে পড়েছ তখন আজ মা বাবাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে চল।

এখন নয় মশাই। কয়েকদিন পরে আশপাশের লোককে জানান দিয়ে যাবো।

বেশ তাই হবে।

সবিতা এদিক ওদিক তাকিয়ে শতদ্রুর ডান হাত খানা প্রসারিত করে তালুর ওপর প্রাণভরে চুম্বন করে। এত শক্তি ছোট্ট এই চুম্বনের? শতদ্রুর সারা শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎ ছুটে চলে যেন। কিছুক্ষণ বিহ্বল অবস্থায় থাকার পর সহাস্যে বলে শতদ্রু, তালুস্পর্শ করে কিন্তু আমার তৃপ্তি নেই। চারিদিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয় শতদ্রু। সবিতা আজ সত্যই একজন নির্ভরযোগ্যকে খুঁজে পেয়েছে—যার কাছে হৃদয় উজাড় করে দেওয়া যায়। তাই মৃদু হেসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। সাইক্লোন শুরু হয়ে যায় তার দেহে-মনে।

সস্ত্রীক গোরাচাঁদবাবু এতক্ষণে এসে পড়েন। বলেন, শতদ্রু বাবাজী আছে যখন একটু জিরিয়ে নিই। ধীরে-সুস্থে বাড়ি যাবো।

ধরা গলায় বলে শতদ্রু, চলুন না। পলাশডাঙার বাড়িতে বাবা বাদে সবাই এসে গেছে! অল্প সময়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে ওখানে।

যাবো। যাবো বাবা। সক্ষম শরীর নিয়ে তোমার ঠাকুরমা আর মায়ের

কাছে উপস্থিত হবার বাসনা আমার যে কি প্রবল তা কেমন করে বোঝাব বাবা ?

মায়ের দিকে তাকিয়ে সবিতা আমতা আমতা করে বলে, বাবা তো ধুলোর ওপর বসে পড়লেন—

আমিও ওর পাশে একটু বসি। তুই শতদ্রুর সঙ্গে একটু কথাবার্তা বল ! অনেক দিন তো দেখাসাক্ষাৎ নেই।

সবিতা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে এগিয়ে যায় শতদ্রুর কাছে। শতদ্রু এতক্ষণে সমস্ত উত্তেজনাকে সরিয়ে দিতে পেরেছে। সহজ সুরে বলে, অনেক দায়িত্ব বেড়ে গেল সবিতা। কেমন করে সামাল দেওয়া যাবে ?

সামাল দিতেই হবে। ওদের সত্তার সঙ্গে মিশে গেছি তো আমরা। ওদের দুঃখ তাই আমাদের বুকে আঘাত দেয়। যন্ত্রণা দিশেহারা করে দেয়।

ঠিক বলেছ সবিতা। আজ বেশ কিছু ভেক-ধারী মানুষ ভালবাসার মুখোশ এঁটে আপন আপন স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত। এই অবস্থায় আমরা—কিছুতেই লক্ষ্য বস্তু ছেড়ে অন্য পথে হাঁটতে পারবো না। ভাগীরথীর অববাহিকায় আমরা তো মিশে গেছি ছন্নছাড়া নিরন্ন মানুষগুলোর সঙ্গে। অপেক্ষায় আছি কবে আমাদের ভগীরথ পুণ্য প্রবাহিনীকে এই ধ্বংসস্তুপের মাঝখানে এনে প্রাণের বন্যা বহিয়ে দেবে।

আজ সবিতার চেহারা দেখে বিস্মিত হয় শতদ্রু। দীর্ঘসময় তাকিয়ে থাকে আকাশের তারার দিকে। আজ সবিতা পুরোপুরি পাল্টে গেছে।

গোরাচাঁদবাবু বলেন, এবার টুক্‌টুক্‌ করে হাঁটি চল মা।

আকাশে অজস্র তারা জ্বলজ্বল করছে। গ্রহ-নীহারিকা উল্কা-ধূমকেতু আপন আপন কর্তব্য সমাপনে ব্যস্ত। বিরাট-বিশাল শক্তি-পিণ্ড প্রতি মুহূর্তে পথনির্দেশ করে যাচ্ছে। যারা এই ভাষা শুনতে ব্যর্থ, জীবনের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হতে বাধ্য তারা।

॥ ১৫ ॥

এমন বিবহোৎসব এ তল্লাটে কোন-দিন কেউ দেখেনি। অবিনাশ ঘোষালের ভাষায়, এ যে সগ্গো-মর্ত্ত-পাতাল ডেকে বিয়ে রে বাবা ! পাড়ার অধিকাংশ লোকজন বিয়ে ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়ে। রাজেশ্বর তর্করত্ন নামে-

কর্মকর্তা। মিলের শ্রমিক-কৃষক মৎস্যজীবী পল্লীর এক পাল মানুষ দিন রাত কাজ-কর্ম করে যায়। জিনিসপত্র যোগাড়-যন্ত্র করা থেকে শুরু করে উঠোন-ঘর পরিষ্কার করা ম্যারাপবাঁধার কাজ হুড়োহুড়ি করে চালায়। বাহার আলী মল্লিক পঞ্চু মোড়ল ভবতারণ বারিক গোবিন্দ ধাড়া দিন রাত দেখা-শোনা করে এই সমস্ত কাজকর্ম।

সবাই বসে ঠিক করে নেয় গোরাচাঁদবাবুর বাড়ি কোন ঝক্কিঝামেলা হবে না। বধূবরণের দিন সমস্ত লোক পাতা-পাড়বে রাজেশ্বর তর্করত্নের বাড়ি।

লোকে এসব দেখে আর চোখ কপালে তুলে বলে, বাব্বা! এক্কেবারে রাজসূয় যজ্ঞ।

এতদিন যারা বিরোধিতা করার জন্যে বিরোধী শিবিরে ছিল, তারাও মনে মনে শতদ্রুর কাজের তারিফ করে।

শাশুড়ীকে নিয়ে সর্বাণী বাইরের বড় প্যাণ্ডেলখানা দেখে। রান্নাশালার বড় বড় উনুনগুলো রীতিমত বড়বড়। পাশে ভাঁড়ার ঘরে মাল পত্র এসে পড়ছে দিন-রাত। কচিরাম কানে-গোঁজা পেনসিল দিয়ে ফতুয়ার পকেট থেকে নোট বই বার করে লিখছে—কোথা থেকে কি জিনিস আসছে। রাজেশ্বর তর্করত্ন ক'দিন পুজোআচ্ছায় রীতিমত ব্যস্ত। পাড়ার লোকজন সকাল হলেই পুজোর ডালা সাজিয়ে দলে দলে ভিড় জমাচ্ছে মন্দির প্রাঙ্গণে। এখন সবার মুখে প্রায় একই কথা—মঙ্গল হোক বাছাদের! সুখে-সচ্ছন্দে থাকুক। অনেক কষ্ট পেয়েছে বাবা ত্যাদোড় হারামজাদাদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে।

সবাই অনুভব করে—ছোট্ট অবস্থা থেকে কোথায় পৌঁছান যায়, লক্ষ্যবস্তু থেকে এক-পা বিচ্যুত না হয়ে।

বিয়ের পরের দিন পাল্কি থেকে বরকনে নামার আগে থেকে প্রতিবেশী মেয়েরা ঘন ঘন শাঁকে ফুঁ দেয়। সবিতাকে সঙ্গে নিয়ে মা-ঠাকুরমার সামনে এসে দাঁড়ায় শতদ্রু। বাঁধ ভাঙা স্রোতের মত তার দু'চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। জ্ঞানদাময়ী অনেকটা কাহিল হয়ে পড়েছেন। শরীরটাও রীতিমত নুয়ে পড়েছে। কিন্তু মনে তার আষাঢ়ে নদীর প্লাবন। শতদ্রুর চোখের জলের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, আমার কবে-আছি কবে-নেই অবস্থা। তা সত্ত্বেও আজ চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে—আরো বাঁচতে চাই আমি। তোমাদের বিজয়-রথের ঘর্ঘরধ্বনি শুনতে আমার কি ভাল না লাগছে—বোঝাতে পারবো না। এই রথের গতি অব্যাহত রাখতে—তোমরা খুব সতর্ক থাকবে ভাই। একটু

অনাসক্ত হলেই বিপদ দেখা দেবে।...এমন একটা সময়ে তোমার চোখে জল কেন ভাই ?

সর্বাণী ছেলের চোখের জল মুছিয়ে দেন আঁচল দিয়ে। সবিতার চোখেও আজ জল। সে জলও তিনি পরমযত্নে মুছে দেন।

শতদ্রু ঠাকুরমার বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে খুবই সচেতন। তা সত্ত্বেও আজকের এই বিশেষ ধরনের ভাষা-চয়ন আর তা-দিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করার ব্যাপারে সে রীতিমত চমকে ওঠে।

রাজেশ্বর এক-জোড়া বালা তুলে দেন সর্বাণীর হাতে। এই পরিবারে নববধূ হয়ে আসার সময় জ্ঞানদাময়ীর হাতে তার শাশুড়ী পরম যত্নে এ দু'টি পরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সর্বাণীর হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন কল্যাণ কামনা করে। আজ সেই কল্যাণসূত্র সর্বাণী বেঁধে দিচ্ছেন সবিতার হাতে। পরম তৃপ্তিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকেন জ্ঞানদাময়ী। প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন। বালা পরাতে পরাতে সর্বাণী বলেন, শতদ্রুর পাশে সারা জীবন তুমি বন্ধুর মত থাক্‌বে মা।

রাজেশ্বর নতুন যুগের নতুন এক শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা দেখেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকেন, তিনি সর্বভূতে অবস্থান করছেন অথচ আমরা জাত-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে দিনরাত জর্জরিত হচ্ছি। হানাহানি কাটাকাটি করে শক্তিক্ষয় করছি। প্রতি নিয়ত পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। সারা জীবন লক্ষ্মীজনার্দনের পুজো আর পৌরোহিত্য করে মনটা ছোট্ট একটা কুয়োর মধ্যে মৃতপ্রায় অবস্থায় আবদ্ধ ছিল। আজ বহুদিন পরে ছোট্ট গণ্ডি থেকে ছিটকে এসে জগতের মূল সুরটি বোধ হয় ধরতে পেরেছেন। শতদ্রু ইহজন্মে তার সন্তান হতে পারে কিন্তু আজকের দুনিয়ায় নতুন করে শিক্ষার যে মহাযজ্ঞ শুরু হয়েছে—সেখানে সে পথপ্রদর্শক হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। একদিন তাদের পরিবার থেকে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অমিততেজে বার হয়ে অন্ধকার মহাশূন্যে হারিয়ে যায়। আজ তার এক সার্থক উত্তরসূরীকে পেয়ে পুরাতন বেদনা কিছুটা প্রশমিত হচ্ছে। জীবনের শেষ সীমানায় পৌঁছে জ্ঞানদাময়ীও আজ অনেকটা সজীব প্রাণবন্ত! এমন মহাতৃপ্তি জীবনে আসবে তা কোনদিন ভাবতেই পারে নি তারা।

বিয়ের দিন সে কী অদ্ভুত ব্যবস্থা! বাহার আলী মল্লিক সাদাকাশ আব্দুর রেজ্জাক দল বেঁধে হ্যাসাকের আলো নিয়ে এগিয়ে চললো।

পিছনে বরের পাল্কি। অজস্র আলো। অন্ধকারের বুক চিরে সবুজ গাছ-পালার পাশ দিয়ে এই যাত্রা—এ শুধু নিজ পুত্রের বিবাহের শুভযাত্রার আনন্দ সৃষ্টি করে না, অনন্ত কালের বুকে আলোর আঁচড়ে এক নবযুগের সূচনা করে। রাজেশ্বরের শরীর থর থর করে কাঁপতে থাকে। মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস এক নতুন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে এক সুরসৃষ্টি হয়। উন্মোচিত হয় অজ্ঞাত রহস্যের দ্বার। তার ভাষায় স্বর্গ-মর্ত-পাতাল আজ নিমন্ত্রিত গরীবের দুয়ারে। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজো হচ্ছে।

শতদ্রু এক ফাঁকে জ্ঞানদাময়ীর পাশে এসে দাঁড়ায়। ইশারায় পাশে বসতে বলেন তিনি। বাড়ির কাজকর্মের কথা বলতে বলতে এক সময় বলেন, ইস্কুল চাষীদের-জমি কারখানার-ইউনিয়ন মাছমারাদের-দেখাশোনা এত কাজ কখন করবি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না ভাই? গোরাচাঁদবাবুর খুড়শাশুড়ী পাশেই বসেছিলেন। একগাল হেসে বলেন, শেষ পর্যন্ত বৌকে ভুলে যাবে না তো ভাই?

ওকে ভোলার উপায় নেই দিদিমা। আমার পাশে পাশে থাকবে আপনার নাতনি।

জবাব শুনে উপস্থিত সবাই হেসে ওঠে। শতদ্রু উঠে পড়ে।

অনেক রাত হয়ে যায় খাওয়া-দাওয়া পর্ব শেষ হতে। সবাইকে বিদায় দিয়ে প্রায় শেষ রাতে ঘরে আসে শতদ্রু। সবিতা তখন বিছানার ওপর কাঠের পুতুলের মত বসে আছে। শতদ্রু ঘরে ঢুকে সহাস্যে বলে, আজ মনে পড়ছে-একদিন রাত্রিতে মন্দিরের পাশের বাড়িতে অনেক লোকজন এসেছিল। গভীর রাত্রিতে হ্যাসাকের আলোর সঙ্গে লোকজন নিয়ে তুমি বাড়ি ফিরলে। আজ তোমার বাড়ির সবাই চলে গেলেন। তুমি থেকে গেলে।

হাঁ থেকে গেলুম। চিরকালের জন্যে থেকে গেলুম।

এ-কথা ভাবতে আমার কিন্তু খুব ভাল লাগছে। সেদিন তোমার ত্রস্ত যাত্রায় আমার মনের মধ্যে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা পূর্ণতার এক প্রতীক-সংকেত রেখে গিয়েছিল আমার কাছে।

বাব্বা! তুমি যে কবি হয়ে গেছ আজ।

আজকের রাত্রিতে অ-কবিও কবি হয়ে যায় সবিতা!

তার পর?

আবার ফিরে আসবে ছকে বাঁধা সাদা-মাঠা জীবনে। চড়াই-উৎরাই ভেঙে শুধু পথ চলবে।

ব্যাস্! আর কিছু থাক্‌বে না?

থাকবে-থাকবে। না থাকলে কঠিন কর্মক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করার প্রেরণা আসবে কোথা থেকে?

'সে পথের পথিক তো আমি—ভয় কিছু নাই।'

নতুন মাটির গন্ধমাখা লেপামোছা ঘর। দেয়াল আলমারীতে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত অসংখ্য বই। ফুলের তোড়া। মালা। নতুন সজ্জায় সজ্জিতা সবিতা। সব কিছু নেশা ধরিয়ে দেয় শতদ্রুকে।

সবিতা ধীরে ধীরে চোখ বোজায়। তার চোখে-মুখে তৃপ্তির অনির্বচনীয় আমেজ।

শতদ্রু সন্ধ্যার কথা ভাবতে থাকে। আজ নীলিমাদির সঙ্গে সুস্মিতাও এসেছিল। উচ্ছ্বসিতা সুস্মিতা একটু ফাঁকা পেয়ে সবিতাকে বলেছিল, তোমার বর আমার কাছে আগে ধরা পড়েছিল ভাই।

জানি। উনি সব কথা বলেছেন আমাকে।

সুস্মিতা দুষ্টুমির হাসি হেসে শতদ্রুর দিকে চোখ ফিরিয়ে। শিশুর মত হাসতে হাসতে শতদ্রু বলেছিল, বাব্বা! অমন সুন্দর ঘটনা, বলার লোভ সামলান যায় নাকি? নদীর ধারে ভেংচি কাটা দিয়ে শুরু করে গলায় মালা পরান পর্যন্ত—সব বলেছি ওকে।

ব্যাস্। এইখানেই শেষ? কৃত্রিম বিস্ময় সৃষ্টি করে বলেছিল সুস্মিতা।

এর জবাবে সবিতা জড়িয়ে ধরেছিল সুস্মিতাকে। শতদ্রুর কাছে টেনে এনে সুস্মিতার কানের কাছে মুখ এনে বলেছিল, অবস্থার ফেরে পড়ে পাঞ্চালী পঞ্চপাণ্ডবের হতে পারলে আজ আমরা দু'জনে কেন এর পাশে দাঁড়াতে পারব না? কী জবাব দিন না মশাই? শতদ্রুর দিকে তাকিয়ে বলেছিল সবিতা।

এমন সময় সর্বাণী ঘরে ঢুকে আসায় এই পর্বের ইতি হয়েছিল সত্য কিন্তু এর কী কোন জবাব দিতে পারতো শতদ্রু? সে কথাই সে ভাবতে থাকে।

এর পর অতনু কয়েক প্যাকেট বই এনে সবিতাকে বলেছিল, জামাই তো আমাদের কিছু নেবে না। কী করবো বল? ওর পছন্দ আমার জানা।

সেদিকে লক্ষ্য রেখেই কলেজ ষ্ট্রীট পাড়া ঢুঁড়ে বইগুলো এনেছি। সাজিয়ে দিয়ে যাচ্ছি দেয়াল আলমারীতে। তোর জন্যে ক'খানা শাড়ি আর একজোড়া দুল এনেছি। ভাইয়ের জিনিসটা নিবি আশা করি।

শতদ্রুর মুখের দিকে একবার বিশেষ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দু'জনে বই গোছাতে আরম্ভ করে। প্যাকেট খুলতে থাকে অতনু। সবিতা বই গোছায়।

মাত্র কয়েক মাস আগের কথা।

সোলেনামা হয়ে যাবার পর একখানা বাস উত্তর ভারত ভ্রমণে বার হয়। কচিরাম পণ্ডুরা বলে, অনেক খাটুনী হয়েছে তোমার। কদিনের জন্যে একটু বাইরে ঘুরে এসো। বাড়ি থেকেও সবাই বলেন, যাও ঘুরে এসো। কাশী এসে গাড়ি খারাপ হয়ে যায়। শতদ্রুর শরীরেও কেমন যেন জ্বর-জ্বর ভাব। বিকালের দিকে দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে আছে—পিছন থেকে পরিচিত কণ্ঠে বলে ওঠে, তুমি এখানে?

ক'দিন বার হয়েছি। এখানে এসে গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে সুস্মিতা বলে, বেশ হয়েছে। এখন ওঠ। ছোট্ট-বেলাকার চপল সুস্মিতার আবির্ভাব ঘটে যায় যেন।

কোথা যাব?

আমার সঙ্গে। কোন আপত্তি আছে?

আপত্তি থাকবে কেন।

আজ আমার চলে যাবার দিন, কিন্তু যাবো না। চল একটা ঘর ঠিক করি।

শতদ্রু উঠে দাঁড়ায়। নদীর ধারে বোডিং হাউসে একখানা ছোট কামরা ভাড়া করে সুস্মিতা। বলে, দুদিন আমরা স্বামীস্ত্রীতে থাকব। সুস্মিতার মুখের দিকে তাকায় শতদ্রু। সুস্মিতার মুখ দিয়ে তখন অজস্র ধারায় ঝরে পড়ছে দুষ্টুমি ভরা হাসি। চাবি নিয়ে ঘর খুলে পাখা চালাতে শতদ্রু আপত্তি করে। বলে, শীত শীত করছে। পাখা বন্ধ কর।

সুস্মিতা শতদ্রুর কপালে হাত দিয়ে বলে, বাপ্‌রে! বেশ জ্বর। শুয়ে পড় তুমি। ডাক্তার চৌধুরীকে ডেকে পাঠাচ্ছি। তোমার গাড়ির লোককেও ডাকছি।

ডাক্তার আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে লোক আসে। সুস্মিতা তাদের জানিয়ে দেয়, জ্বর সেরে একটু সুস্থ হয়ে উঠলে আমি ওকে বাড়িতে

পাঠিয়ে দেবো। আপনাদের বাড়ি ফেরার আগেই হয়তো উনি ফিরে যাবেন। কিছু ভাবতে হবে না।

গাড়ির লোক জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি নার্স?

হ্যাঁ। কোন ভয় নেই। সেরে গেলেই আমি ওকে পাঠিয়ে দোবো।

রাত্রিতে মাথায় জলপাটি লাগাতে লাগাতে এক সময় শুয়ে পড়ে সুস্মিতা। শতদ্রু তার মাথায় হাত দিয়ে বলে, মিতা ও-রকম কুঁকড়ে শুয়ে আছ কেন? ভাল করে শুয়ে পড়। ঘুম না হলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে বিদেশে।

কোন কথা বলে না সুস্মিতা। সোজা হয়ে শুয়ে পড়ে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। শতদ্রু তা স্পষ্ট অনুভব করে।

সকালে ঘুম ভাঙার সময় সুস্মিতাকে পাশে দেখতে পায় না শতদ্রু। বিছানা ছেড়ে এদিকওদিক তাকায়। ঘরের বাইরে বারান্দায় আসার পথে সুস্মিতার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। হাসতে হাসতে বলে সুস্মিতা, দেখি আর জ্বর আছে কি না?—না। বাঁচা গেল বাবা।

চা-খাবার সময় টেবিলে বসে সুস্মিতা বলে, তোমার আমার মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টির জন্যে তুমি দায়ী নও। দায়ী আমরা আর আমাদের ঠুনকো আভিজাত্য বোধ। এই অবস্থা আমাদের একটি সরল রেখায় মিল্‌তে দিল না। এর জন্যে আমার কোন দুঃখ নেই। এমন দুঃখ নিয়ে অনেককেই সারা জীবন কাটাতে হয়েছে। আমিও কাটাব। এই জীবনে আমার চরম-আনন্দ কী জান? কদিন তোমাকে খুব কাছে আপন করে পাব। এর পরেও পাব মাঝে মাঝে।

শতদ্রু সুস্মিতার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসতে হাসতে বলে, মিতা তোমার জীবনটাকে তুমি অহেতুক ভারাক্রান্ত জটিল করে তুলছো। কী প্রয়োজন আছে, আমার সঙ্গে এই ধরনের সম্পর্ক রেখে?

আমি সব কিছু জেনেই তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাই শতদ্রু। আমি নীলিমাদির কাছ থেকে খবর পেয়েছি আগামী ফাল্গুনে তোমার বিয়ে। সবিতার কথাও আমি জানি। তার সঙ্গে তোমার একাত্ম ঘনিষ্ঠতার কথাও আমার অজানা নয়। তা সত্ত্বেও তোমার কাছে আমি স্বীকার করছি, স্বামী হিসাবে আর কাউকে আমি এ জীবনে গ্রহণ করতে পারব না।

একটা প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প শুরু হয়ে যায় যেন সুস্মিতার কথায়। থর-থর করে কাঁপতে থাকে শতদ্রু। সুস্মিতা বলে, তোমার সঙ্গে সবিতার দ্বৈত জীবন সুখের হোক। তোমার পুত্র কন্যারা এলে তাদের বুকের মধ্যে রেখে

আমি আমার পাওনা আদায় করে নোব।

এই ধরনের চিন্তা তুমি ত্যাগ কর সুস্মিতা। এর মধ্যে দিয়ে কারো মঙ্গল হবে বলে মনে হয় না আমার। কথাগুলি বলার পর কেমন যেন চমকে উঠে শতদ্রু। তার কথাগুলি সত্যি তো?

সুস্মিতা বলে, কথাগুলো তুমি আজকের শতাব্দীর দিকে তাকিয়ে বলছো না শতদ্রু। আগামী শতাব্দীর দিকে তাকিয়েও বলছো না। তোমার বিবাহিত জীবনকে কোন ক্রমে কলুষিত করতে পারে না—তোমার ভালবাসার সম্পর্ক। এই জায়গায় সজাগ পদক্ষেপ থাকলে ভয়টা কিসের? দেশে-দেশে সমাজে-সমাজে ভেকধারীদের আদর্শ নিষ্ঠার অভাবে সারা পৃথিবীতে এক দুর্বিসহ সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের জীবন দিয়ে তার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ সৃষ্টি করতে হবে না? ভয় পেও না শতদ্রু। বলিষ্ঠ আদর্শবাদ মানুষের সৃষ্টি। মানুষের চিন্তার ফসল। পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে এর মূল্য দিতে হবে আজ।

জ্বর সারার পর কদিন শতদ্রুকে নিয়ে কাশীর ঘাটে ঘাটে বেড়ায় সুস্মিতা। নৌকোয় চেপে ঘুরে দেখায়। পুরো রামায়ণ খানা একটি বাড়ির পাথরে খোদাই দেখে সুস্মিতা চুপি চুপি বলে শতদ্রুকে, এমনি ধরনের অসাধ্য সাধনই আজকের দিনে—কিছু করা।

আজ যাবার সময় সুস্মিতা সবিতাকে বলে গেছে, জব্বলপুরে এক উদার হিন্দীভাষী ইঞ্জিনিয়ার যুবকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। বিলেত থেকে আসার পথে প্লেন দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছে।

কথার জবাবে সবিতা বলেছে, তোমার সঙ্গে আমি 'গঙ্গাজল' পাতালাম ভাই। তোমার মন খারাপ হলেই চলে আসবে এখানে।

শতদ্রু বিরক্ত হবে না?

শতদ্রু সামনের নদীর স্রোতের মত ও শুধু ভেসে যেতে জানে। আর কিছুই জানে না। আজকের দুনিয়ায় এক ভিন্ন ধরনের মন পেয়েছে আমার স্বামী। সেটাই আমার কাছে গৌরবের বস্তু।

সুস্মিতার হিন্দীভাষী যুবকের সঙ্গে বিবাহকাহিনী শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে শতদ্রু। সবিতার মনে কোন্ বিষয়টি উপস্থিত করার জন্যে এটা তৈরি হয়েছে তার উৎস শতদ্রুর হৃদয়ে গভীর আঘাত সৃষ্টি করে আজ।

বিয়ের বাজার করার দিন মেডিকেল কলেজের সামনে দেখা হয় তরু চৌধুরী আর নিলয়ের সঙ্গে। তরু চৌধুরী সেদিন বলেছিল, আমার রাস্তাটা

তুমিই বাৎলে দিয়েছিলে ভাই। সেজন্যে তোমায় প্রাণভরে ভালবাসি। নিলয় আচার্য শতদ্রুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

এরপর বন্যার মত কচিরাম পণ্ডু গুলে ভাবতারণ বাউক গোবিন্দ ধাড়া সাদাক্কাশ, পুলিন দাশ বাহার আলি মল্লিক ইত্যাদির অসংখ্য মুখ ভেসে আসে শতদ্রুর সামনে। ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডেকেছে যেন। আরো অসংখ্য মুখ ছুটে আসছে। এই বন্যার স্রোতে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যেতে হবে আগামী দিনে। অনেক কাজ হাতে।